ইসলাম ও যুক্তির নিরিখে

মূল : মুফতী মোঃ শফী (রহঃ)
ও
শাইখুল ইসলাম আল্লামা তক্বী উসমানী (দাঃ বাঃ)

অনুবাদ
মোস্তাফিজুর রহমান কালাম

ইসলাম ও যুক্তির নিরিখে

জন্মনিয়ন্ত্রণ

মূল

মুফ্‌তী মোহাম্মদ শফী (রহঃ)

শায়খুল ইসলাম,আল্লামা,মুফতী তাকী উসমানী (দাঃবাঃ)

অনুবাদ

মুফতী মুস্তাফিজুর রহমান কাসেমী

মুহাদ্দিস,জামিয়া রশীদিয়া দক্ষিণ খাঁন,উত্তরা,ঢাকা ।

ইমাম,খতীব বাবলী জামে মসজিদ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ।

প্রকাশনা

ফখরে বাঙ্গাল পাবলিকেশন্স ঢাকা ।

১৮৪, তেজগাঁও শিল্প এলাকা,ঢাকা-১২০৮

বর্তমান আলেম সমাজের অন্যতম মুরুব্বী, ক্বাওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মজলিসে শুরার সিনিয়র সদস্য, বহুগ্রন্থ প্রণেতা, প্রখ্যাত সাহিত্যিক, ঐতিহ্যবাহী জামিয়া হোসাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদ, মিরপুর, ঢাকা এর সম্মানিত প্রিন্সিপাল, পরম শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ। Av j vgv Av j nvR †gv ̄ vdv Avhv `( `vt ev)

এর

‡`vqv I AwfgZ

শান্তির ধর্ম ইসলামকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বিশ্বের তাবৎ কুফুরী শক্তি আজ ঐক্যবদ্ধ। সময়ের ঘুর্নিপাকে শান্তির মিশন আজ অশান্তির বাহন হিসেবে চিহ্নিত। এককালের দুর্দমনীয় প্রতাপশালী মুসলিমজাতী আজ বিশ্বব্যাপী চরম নির্যাতনের শিকার। ইসলামী মূল্যবোধ এবং নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে আজ বিশ্ববাসী হতাশাগ্রস্থ। আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে আজ শান্তি শৃংখলা এবং স্থিতিশীলতা অনুপস্থিত।

বিশ্বময় উদ্ভব হচ্ছে বড় বড় ফিৎনা এবং মানবতা বিধ্বংসী মতবাদ- যার লেলিহান অগ্নিশিখায় দাউ দাউ করে জ্বলছে মুসলিম বিশ্ব। জাহেলিয়্যতের নবউদ্দীপনা ও আকর্ষনীয় শ্লোগান নিয়ে ময়দানে এখন ইসলাম বিদ্বেষী কুফরী শক্তি। ছলে বলে কুট কৌশলে এই কুফরী শক্তি মুসলিমজাতির হাজার বছরের অর্জিত অবদানকে ধূলিসাৎ করে দিতে উদ্ধত। ইসলামের মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাস সমূহ নস্যাৎ করার উদ্দেশে ঈমান বিধ্বংসী নানা রকম মতবাদ আবিস্কারে তারা মত্ত। বাকস্বাধীনতার নামে তাদের ইসলাম বিরোধী অপপ্রচার অযৌক্তিক বিষোধগার, অশ্লিল কুরুচিপূর্ণ আক্রমনাত্বক বক্তব্য এবং লিখনি আজ মুসলিম বিশ্বকে অস্থির করে তুলেছে।

অপর দিকে ইয়াহুদী, খৃষ্ঠান, ব্রাক্ষন্যবাদীদের প্রতারণার শিকার হয়ে এক শ্রেণীর মুসলমানরাও কোরআন সুন্নাহ বিরোধী বহু অবৈধ কর্মকান্ড করে যাচ্ছে। পার্থিব জীবনের তুচ্ছ বিলাসিতা অর্জনের লক্ষে প্রতি নিয়ত হারাম ও পাপ কাজে লিপ্ত হচ্ছে। স্বাথান্বেষী মহলের প্ররোচনায় দুনিয়ার হীন স্বার্থ হাসিলের জন্য তারা হারামকে হালাল ঘোষনা করতে কুন্ঠাবোধ করে না। পরিবার পরিকল্পনা এবং "জন্মনিয়ন্ত্রনের ব্যাপারটি এরই অন্তর্ভূক্ত।"

ইসলামী আইনপ্রনেতা 'ফুকাহায়ে কেরাম' জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি সমূহের মাঝে কোন কোন পদ্ধতিকে বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে আপৎকালীণ জায়েজ বলেছেন। কিন্তু খাদ্যাভাবের ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী কোন পদ্ধতি অবলম্বন করাকে কোন ফকীহ আদৌ জায়েজ বলেননি। এবং খাদ্যাভাবের ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করাকে সরাসরি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ছিফাতে রায্‌যাকিয়াত (তথা অতিশয় অন্নদাতা) এর প্রতি অনাস্থা প্রকাশ বলে মন্তব্য করেছেন। যা অবশ্যই ঈমান বিধ্বংসী মতবাদ।

দূঃখভরাক্রান্ত হৃদয়ে আজ এ সত্য বলতে হচ্ছে যে, মুসলিম বিশ্ব আজ ইয়াহুদীদের শেখানো সবক তোতা পাখীর মত মুখস্থ করে সে অনুযায়ী আমল করতে তৎপর।

"পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ" বিষয়ক গ্রন্থাদী আরবী উর্দ্দু ভাষায় ব্যাপকভাবে রচিত হয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ মুসলমানদের ঈমান আক্বীদা সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাভাষাভাষী ভাই বোনদের এ বিষয়ে জ্ঞাত করা খুবই জরুরী। আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র তরুন উদীয়মান আলেমে দ্বীন মুফ্‌তি মুস্তাফিজুর রহমান কাসেমী বাংগালী ভাইবোনদের এ প্রয়োজন মিটানোর জন্য এগিয়ে আসেন। বিখ্যাত আলেম শায়খূল ইসলাম আল্লামা মুফ্‌তি তাকী উসমানী কর্তৃক রচিত "যবতে ওয়ালাদাত কি শরয়ী আওর আকলী হাইসিয়্যত" নামক কিতাবটি বঙ্গানুবাদ করেন। কোন বইপুস্তকের অনুবাদ করা মূলগ্রন্থ রচনার চাইতে কঠিন কাজ। মুফ্‌তি মুস্তাফিজুর রহমান একাজটি কিন্তু খুবই যোগ্যতার সাথে সম্পন্ন করেছেন। সহজবোধ্য শব্দাবলীর মাধ্যমে তিনি বইটি ভাবানুবাদ করেছেন। আমার ব্যস্ততা সত্ত্বেও তার অনুবাদ কপিটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছি। লেখক নবীন হিসেবে যথেষ্ট শ্রম ব্যয় করেছেন।

আশাকরি অনুবাদটি পাঠকবৃন্দের জন্য আলোচ্য বিষয়ের উপর দিশারী ও কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করবে। মহান আল্লাহর দরবারে আবেদন, হে আল্লাহ, আপনি তার এ শ্রমকে কবুল করুন- তার ও আমাদের সকলের জন্য এই আমলকে নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন।

আমীন॥
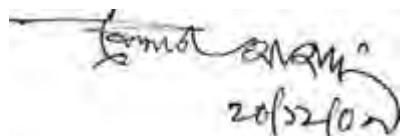
মোস্তফা আযাদ
২০/১২/০৯ইং

DrmM

যাদের কল্যাণে এই পৃথিবীর আলো দেখতে পেলাম
যাদের সযত্ন তারবিয়তে আমার বিকাশ ও বর্ধন
যারা অকাতরে সারাটা জীবন শুধু দিয়েই গেল আমায়
আজ যখন তাদের নেওয়ার পালা, তখন তারা নেই ।
জীবনের এই মধুরলগ্নটা তাদের বিয়োগ- ব্যাথায়,
বিরহ-যন্ত্রনায় হয়ে উঠে বিষাদময় ।

“হে আল্লাহ! আমার সেই জান্নাতবাসী আব্বা আম্মাকে
ফেরদাউসের সুউচ্চাসনে তোমার সান্নিধ্য দানে
পরিতৃপ্ত করে দাও ।”

--অনুবাদক

সূচিপত্র

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

==

Abev`‡Ki wb‡e`b

শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী (দাঃবাঃ) শেষ নবীর আখেরি যামানার উম্মতের জন্য মহান প্রভূর পক্ষ হতে এক অশেষ নেয়ামত স্বরূপ। উম্মতের যে কোন জটিল মাসআলার বিজ্ঞান সম্মত সঠিক ও সহজ সমাধান প্রদান করেণ বিশ্ব নন্দিত এই আলেমে দ্বীন। তিনি ইউরোপ,আমেরিকাসহ বিশ্বের যে কোন প্রান্তে ছুটে যান সত্যসন্ধানী মুসলিম উম্মাহর আহবানে। তাদের তৃঞ্চার্ত হৃদয়কে সিক্ত করেণ ইলমে অহী সমৃদ্ধ স্বীয় ইজতেহাদী প্রজ্ঞা দ্বারা। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর একেকটি ফিক্হী সেমিনার সব দেশেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে থাকে। হল রুমের উপচে পড়া ভীড়ের মাঝে অনেক অমুসলিম মনীষি,স্কলার,ডাক্তার,ইঞ্জিনিয়ার,ব্যারিষ্টার ও অর্থনীতিবিদগণও উপস্থিত থেকে গভীর মনোযোগের সাথে তাঁর আলোচনা শুনে পাথেয় সংগ্রহ করেণ। তিনি যখন যে বিষয়ের আলোচনা করতে থাকেন,মনে হয় যেন এ বিষয়ের তিনিই সর্বাধিক জ্ঞানী,মহাপন্ডিত। শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী (রহঃ) মৃত্যুর পূর্বে ভবিষ্যত বানী করে গিয়েছিলেন যে আমার (লেখা অসমাপ্ত) "ফাতহুল মুলহীম শরহে মুসলিম" কিতাব খানি যিনি সমাপ্ত করবেন তিনি যামানার শায়খুল ইসলাম হবেন। বহুকাল বিরতির পর উম্মাহর এই ব্যপক চাহিদাটুকু পূরনের জন্য কলম হাতে নিলেন আল্লামা তাকী উসমানী (দাঃবাঃ)। জাতি "তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহীম" নামক হাদীস শাস্ত্রের এক অমর ব্যাখ্যা গ্রন্থ উপহার পেল। আর যামানার শায়খুল ইসলাম হিসেবে বরণ করে নিল বিচারপতি মুফতী তাকী উসমানী (দাঃবাঃ) কে। তাঁর রচিত কিতাবের সংখ্যা হাকিমুল উম্মত হযরত থানবী (রাহঃ) এর কিতাবাদী কেও অতিক্রম করেছে এবং লিখে যাচ্ছেন অনবরত উম্মাহর চাহিদা অনুসারে। বাংলা,আরবী,ইংরেজী সহ বিভিন্ন ভাষায় তা অনুদিত হয়ে মানবতার কল্যাণে অসীম অবদান রেখে যাচ্ছে। অধীর আগ্রহে জাতি প্রতিক্ষায় থাকে তাঁর নতুন কোন বইয়ের। কারণ তাঁর লেখা বই মানে নতুন কোন তত্ত্ব তথ্য সম্বলিত জ্ঞান সম্ভার। আমাদের অনুদিত তাঁর লেখা "যবতে ওয়ালাদাত কি শরয়ী আওর আকলী হাইসিয়্যত" তথা ইসলাম ও যুক্তির নিরিখে জন্মনিয়ন্ত্রণ" বইটিও এই বিষয়ের উপর এক অনন্য রচনা। কুরআন, হাদীরসের অকাট্য দলীলাদির পাশাপাশি নিরেট যুক্তির মাধ্যমে বিষয়টির বাস্তবতাকে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন, যা পঠনে প্রতিটা সচেতন পাঠক তাঁর এই জ্ঞান গভীরতা দেখে শুধু মুগ্ধই হবেন না বরং এ বিষয়ের সকল সংশয় ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে বাস্তব সত্যটাকে অনুধাবন করতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। সেই সাথে জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রবক্তাদের দলীল ও যুক্তি সমুহেরও দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন,এমনিভাবে যারা আর্থিক সংকট মোকাবেলার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে জরুরী মনে করে থাকে,এই ভুলের ও তিনি অপনোদন করতঃ এর বিকল্প ব্যবস্থা বাতলে দিয়েছেন। সব মিলিয়ে এই বই বাংলাভাষী পাঠকদের খুব উপকারে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আর অনুবাদের ক্ষেত্রে সাধারণ পাঠকদের সহজে বুঝার জন্য সরল ভাষার ব্যবহারের যথা সাধ্য চেষ্ঠা করা হয়েছে। অনুবাদ কর্মটি এমনিতেই একটি দূরুহ ব্যাপার। তদুপরি আমার মত নগন্য,অধম, অযোগ্য যখন বিশ্ব নন্দিত আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী (দাঃবাঃ) এর কিতাব অনুবাদের জন্য কলম ধরে,তখন সকল জড়তা এসে গ্রাস করে ক্ষুদ্র ইচ্ছটাকে,দুরুদুরু বুকের কম্পন যেন ফেলে দিতে চায় আনাড়ি হাত থেকে কলমটাকে। কিন্তু সচেতন পাঠকবর্গ,সুহৃদবন্ধু মহল ও আমার মুরুব্বী পর্যায়ের উলামাগণের বিশেষ পরামর্শ,নিজের সকল অক্ষমতা অযোগ্যতা ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্যেও সে দিকে খেয়াল না করে পিপিলিকার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হিসেবে সামনে এগিয়ে যেতে শক্তি সাহস যুগিয়েছে।

এদিকে পশ্চিমা বিশ্বের প্ররোচনায় এদেশের কতিপয় লোকের অত্যাধিক অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে এদেশের মুসলিম জনসাধারণ যখন জন্মনিয়ন্ত্রণের মত জঘন্য পাপের মায়াজালে ফেসে যাচ্ছে। আর বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক রাব্বুল আলামীন এর অসীম প্রতিপালন ক্ষমতার উপর অযথাই সংশয় সৃষ্টি করতঃ ঈমান হারা হচ্ছে। সে সকল বিভ্রান্তির শিকার ভাই-বোনদের প্রতি হযরতের এই আমানত বনাম হকের দাওয়াতটুকু পৌঁছে দেয়ার জন্যেই কলম হাতে নিতে প্রেরণা যুগিয়েছে।

এ অধমের বহুদিনের লালিত স্বপ্ন ছিল বিশ্ব বরেণ্য আলেমে দ্বীন শায়খুল ইসলাম বিচারপতি মুফতী তাকী উসমানী (দাঃবাঃ) এর চেহারা মোবারক এক নজর দেখার। অবশেষে আল্লাহর মেহেরবাণীতে তা নসীব হল হযরতের এই বৎসর বাংলাদেশ সফরের সৌজন্যে। বারিধারাস্থ "হোটেল সামার প্লাস ইন্টাঃ" এর নিচ তলায় লিফ্‌ট থেকে যখন নামলেন এলমে নববীর এই বর্তমান সূর্য। অপেক্ষমান ভক্তবৃন্দের সাথে সালাম,মুসাফাহা ও কুশল বিনিময়ের এক সুযোগে অনুবাদের এই হাতের লেখা কপিটা হযরতের হস্ত মোবারকে অর্পন করা হলো। হযরত তার কয়েক পৃষ্ঠা উল্টিয়ে মূল উর্দূ বইটি ভাল করে দেখে আমার হাতে ফেরৎ দেয়ার সময় দরদমাখা কন্ঠে বলছিলেন "মাশা আল্লাহ! আপনেতো বহুত উম্‌দা কাম কারদিয়ে...।" মাশা আল্লাহ! আপনিতো একটি চমৎকার কাজ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা আপনার এই মেহনতকে কবুল করে নিন। এবং পাঠকবৃন্দ যেন অনেক অনেক উপকৃত হতে পারে আল্লাহ সে তৌফিক দিন। অতপর সিলেট গামী বিমান ধরার উদ্দেশ্যে সবার থেকে বিদায়ী সালাম জানিয়ে চলে গেলেন। এ সাক্ষাতের সুযোগ করে দিলেন হযরতের খাছ খাদেম,ছাত্র,খলিফা সাবেক উস্তাদ করাচী দারুল উলুম মাদ্রাসার ও বর্তমানে লন্ডনের একটি কলেজের ইসলামিক প্রফেসর মুফতী আঃ মুন্তাকীম (সিলেটি) ভাই। বইটির অনুবাদ কর্মে সহায়তা করেছেন বহুগ্রন্থ প্রণেতা অনুবাদক মাওঃ মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন সাহেব, মুফতী আঃ মতীন মুজিব, মাওঃ মুহীউদ্দীন, মাওঃ দ্বীন ইসলাম, হাফেজ মাওঃ নাসির উদ্দিন। এছাড়াও মোঃ সেলিম, জাবেদ, মেহেদি, ইকবাল, রুবেল, সহিদুল ইসলাম, আক্তার হোসেন, কামরুল, রোকন, পারভেজ, নিটু, জহির, সম্রাট, রিপন(ছোট) সুজন, জহির, রিপন, হাফেজ মিকাঈল ও মাওঃ রুহুল আমিন সহ যারা পরামর্শ উৎসাহ দিয়ে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

যেহেতু বইটি হযরতের প্রথম লেখা (১৯৬০সাল) এর পর এ বিষয়ে বহু পরিবর্তন এসেছে। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নতুন বিষয় যেমন-গর্ভপাত ও সমকালিন শীর্ষ মুফতীগণের ফতুয়া ইত্যাদী অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত হয়েছে। ভুলভ্রান্তি মানুষের স্বভাবজাত বিষয়,তাই উক্ত বইয়ের অনুবাদ ও সংযোজনে যদি কোন ভুল ভ্রান্তি সুহৃদ পাঠক মহোদয়ের দৃষ্টি গোচর হয় তাহলে দয়া করে জানালে কৃতজ্ঞ হব।

পরিশেষে এ মহতি উদ্দ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তায়ালা সকলকে উত্তম বিনিময় দানে ধন্য করুন। মূল লেখক (শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসানী (দাঃ বাঃ) কে আল্লাহ তায়ালা সুস্বাস্থ ও হায়াতে তায়্যেবাহ দান করুন। আমাকে আমার জান্নাতবাসী আব্বা-আম্মা, শ্রদ্ধেয় বড়ভাই সহ পরিবারের সবাইকে উভয় জাহানে কামিয়াবী দান করুন। আমীন ॥

বিনীত
মুস্তাফিজুর রহমান।
০৫-১১-০৯ইং শনিবার
বাবলী জামে মসজিদ
তেজগাঁও শিল্প এলাকা,ঢাকা।

cKvk‡Ki K_v

বুযূর্গ ও আকাবিরদের নামে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান করা উপমহাদেশের এক প্রাচীন ঐতিহ্য। যেমন- মাকতুবাতুল আশরাফ, মাদানী কুতুবখানা, কাসেমিয়া, রশীদিয়া, যাকারিয়া ইত্যাদী লাইব্রেরীর নাম আমাদের সকলের-ই জানা। ফখরে বাঙ্গাল পাবলিকেশন্স ঢাকা এ ধারারই নতুন সংজোযন। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তা নতুন হলেও ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম (রহঃ) সর্ব যুগেই সুপরিচিত ব্যাক্তিত্ব ও আহলে হক্কদের প্রেরণার উৎস। যে কোন বাতিলের বিরুদ্ধে তর্ক যুদ্ধে তিনি অবশ্যই বিজয়ী হয়ে আসতেন। তিনি ছিলেন হযরত উমরের (রাঃ) মত খেদা প্রদত্ব প্রভাব ও ভাবগাম্ভির্যপূর্ণ ব্যাক্তিত্বের অধিকারী। কথিত আছে তিনি যদি কখনো ব্রাহ্মণ বাড়িয়া আদালত প্রাঙ্গণ দিয়ে হেটে যেতেন তাঁর খড়মের শব্দ শুনে জর্জ ও উকিলগণ তার সম্মানার্থে দাড়িয়ে যেতেন, তিনি চলে যাওয়ার পর পূণঃ এজলাস আরম্ভ হত। মিশরের প্রসিডেন্ট জামাল নাসের বিশ্বের শ্রেষ্ট আলেমদের নিয়ে যে সভা করেছিলেন,সে সভার সভাপতিত্ব করে বাঙ্গালী জাতির গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম (রাহঃ)। কিন্তু! দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম এই কিংবন্তী মহামনীষিকে সঠিকভাবে জানে না, এবং তাঁকে স্বরণ রাখার তেমন কোন অবলম্বনও পায়না। তাই তাঁর স্মৃতিটুকুকে স্বরণ রাখার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হিসেবে " ফখরে বাঙ্গাল পাবলিকেশন্স ঢাকা" নামক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানটির আত্নপ্রকাশ। এই নামটিকে পছন্দ করেছেন তাঁর স্নেহভাজন ছাত্র ও একান্ত খাদেম- আল্লামা মুফ্তী নূরুল্লাহ (দাঃবাঃ) বি, বাড়িয়া। ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি "খাসায়েলে মুস্তফা (সাঃ)" নামক প্রিয় নবীজির (সাঃ) দেহাবয়বের উপর একটি বই প্রকাশ করে পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। জ্যাষ্টিজ আল্লামা তাকী উসমানী (দাঃবাঃ) রচিত বইটির অনুবাদ " ইসলাম ও যুক্তির নিরিখে জন্মনিয়ন্ত্রণ" এই প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় খেদমত। শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী (দাঃবাঃ) রচিত কোন বইয়ের ব্যাপারে কিছু বলার অপেক্ষা রাখেনা। তবে অনুবাদ কর্মটি কেমন হয়েছে? সেই বিবেচনার ভার সম্মানিত পাঠক মহোদয়ের উপর রইল। পাঠকদের বিচার-বিশ্লেষণই আমাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পাঠকগণ যদি এর থেকে নূনতম উপকৃতও হন তবেই আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব। সময়ের অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় "জন্মনিয়ন্ত্রণ" এর ব্যাপারে একটি বই আপনাদের খেদমতে পেশ করতে পেরে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে যে সকল সুহৃদ, মুরুব্বীগণের, বিশেষ করে আমার শ্রদ্ধাভাজন উস্তায প্রবীন সাহিত্যিক আল্লামা মুস্তাফা আযাদ (দাঃবাঃ) এর কথা না বললেই নয়। যিনি শত ব্যস্ততা সত্যেও বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে বিভিন্ন জায়গায় সংশোধন করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সকলকে দুজাহানের উত্তম বিনিময়ে দানে ধন্য করুন। সময়ের অতীব গুরুত্বপূণ্ বিষয়ের উপর রচিত এধরনের খেদমতের ধারা যেন অব্যাহত রাখতে পারি, (পাঠক মহোদয়ের কাছে সেই সহযোগিতার নিবেদন করছি)। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে নেক কাজে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসার তৌফিক দান করুন। আমীন।

দোয়ার মুহতাজ
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান।

বিছ্মিল্লাহির রহ্মানির রহীম

Cvi¤Kv

বেশ ক' বছর থেকেই জন্ম নিয়ন্ত্রণের আন্দোলন আমাদের গোটা দেশ জুড়ে অত্যন্ত জোরে শোরে চলে আসছে। আর পশ্চিমা বিশ্ব আমাদের প্রাচ্যের দেশ সমূহে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে আদা-জল খেয়ে মাঠে নেমেছে। "নিউইয়র্ক টাইমসের" এক প্রতিবেদনে তার একটা অনুমান সহজেই করা যায়। পত্রিকাটি লিখে যে ১৯৫৯ সালের জুলাইয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্টসিয়াল কমিটি সে দেশের প্রেসিডেন্টের নিকট এই মর্মে জোর দাবী জানায় যে "আমাদের অনুদান সে সব দেশেই দেয়া হোক যারা জন্ম নিয়ন্ত্রণ মতবাদ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসবে"।

"নতুন কিছু কররে" এই শ্লোগান তো সর্ব যুগেই জনপ্রিয় হয়ে আসছে। আমাদের দেশের জনগণকেও এই মন্ত্রে দারুণ ভাবে উজ্জীবিত হতে দেখাগেল। আর এই মনভোলানো শ্লোগানে পাগল হয়ে বর্ণনাতীত ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুক্ষীন হয়েছে, হচ্ছে। আমার তো মনে হচ্ছে। এই দেশে যারা জন্ম নিয়ন্ত্রণ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে তারা হয়ত এর উদ্দেশ্য সম্পর্কেও অবগত নয়। যেই নীল দংশনে পশ্চিমা বিশ্ব কাতরাচ্ছে। সেটাই তারা আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

কিন্তু! আল্লাহর শুকরিয়া যে এখনও তাঁর কিছু বান্দা রয়েছেন যারা এই বিষয়টার সঠিক সিদ্ধান্ত কেবল আবেগ দ্বারা নয়, নির্ভরযোগ্য দলীল প্রমান দ্বারা জানতে চান। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই কাজ কতটুকু যথার্ত? এবং তা করার ব্যাপারে আক্বল, যুক্তি, বিবেক কি বলে? এই বিষয়টার সঠিক সিদ্ধান্ত জানতে আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন পিতা মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব এর নিকট অনেকদিন যাবত বিভিন্ন স্থান থেকে প্রশ্ন পত্রের এক বিশাল ভাণ্ডার জমা হতে লাগল। যার থেকে অনুমান হতে লাগল যে জনসাধারণ এই মাসআলা জানতে অত্যন্ত আগ্রহী। আমার আব্বাজানেরও ও বহু দিন থেকে ইচ্ছা ছিল এই বিষয়ের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব রচনা করবেন। কিন্তু! সীমাহীন ব্যস্ততার দরুণ তিনি নিজে সেটা আর শুরু করতে পারলেন না। তখন আমাকে নির্দেশ দিলে আমি যথাসাধ্য তাঁর হুকুম পালনের চেষ্টা করলাম। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণ এর শরয়ী বিধান অধ্যায়টা নিজে লেখা সত্যেও তা আমার নিকট পুরোপুরি সন্তে

াষজনক মনে হয়নি বিধায় এব্যাপারে শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের নিকট অনুরোধ করলাম। তিনি শত ব্যস্ততা সত্যেও এ অধ্যায়টা নিজেই লিখে দিলেন। যার দ্বারা এই কিতাব খানা পাঠকদের জন্য আরও অনেক বেশী উপকারী হয়েগেল। আলহামদুলিল্লাহ্! এছাড়া অন্যান্ন সকল অধ্যায়ের মূলবিষয় বস্তুটা সহজ ভাষায় বুঝার ক্ষেত্রে যতটুকু মেহনত করার দরকার ছিল তা আমি করেছি। আর আলহামদুলিল্লাহ্! এই কথাটা সর্বদা মাথায় রেখে সামনে অগ্রসর হয়েছি যাতে করে আলোচনা করতে গিয়ে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব না এসে যায়। একটা মতবাদ কায়েম করে এর পক্ষে দলীল কায়েম করা হয়নি বরং দলীল গুলি অধ্যায়ন করে এর ভিত্তিতেই মূল বিষয়টার আলোচনা করা হয়েছে।

সূধী পাঠকদের নিকটও এই অনুরোধ থাকবে যে আপনারাও এই কিতাবটি এভাবে পড়বেন যেভাবে আমি এই বিষয়ের অন্যান্য কিতাব পড়ে থাকি। অর্থাৎ পূর্বথেকেই কোন চিন্তাধারা ঠিক করে সামনে চলা নয় বরং কিতাবে যা আছে সেটাই চিন্তা চেতনায় স্থানদেয়া একবারে নিরপেক্ষভাবে। যেমনটা একজন সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি করে থাকে, এভাবে অধ্যয়ন করবেন। এতদসত্যেও যদি লেখায় কোন ভুল ধরা পড়ে অথবা কোন বিষয় বিপরীত মনে হয় তাহলে আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ হব, সত্যটা গ্রহণ করতে কখনো কোন দ্বিধা নেই। এবং কোন সংকোচ বোধ করিণা। পরিশেষে ঐ সকল সুহৃদ বন্ধুদের অন্তরের অন্তস্থল হতে শুকরিয়া আদায় করছি যাঁরা আমার এই "প্রথম রচনা" কে সুবিন্যস্ত করতে কার্যক্ষেত্রেও সুপরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সঠিকভাবে সহযোগীতা করেছেন। বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব মাওঃ মুহাম্মদ রফী উসমানী এর কথা না বললেই নয়।

আর মহা মহিম আল্লাহ্ তা'য়ালার শুকরিয়া তো আদায় করার কোন ভাষাই জানা নেই যিনি আমার মত এক জীর্ণশীর্ণ ক্ষুদ্র মানুষের উপর এত বড় মেহেরবানী করেছেন। তাঁর কাছেই প্রার্থনা যে এই উল্টাপাল্টা (!) বাক্য গুলিকে কবুল করেণ। আর পাঠকদের জন্য তা উপকারি করে দেন। "অমা যা'লিকা আলাইহি বি আযীয।"

মোঃ তাকী উসমানী
১৪, জানুয়ারী -১৯৬১ ইং
৮৭১, গার্ডেন ইষ্ট করাচি।

wemwgjwni ingwbi inxg

ÒAvjnvg` wjjvnx IqvKvdv IqvmvjvgbAvjv Bew`wnjvhx bvmZvdv|Ó

‡h wel‡qi Av‡jvPbv

জন্ম নিয়ন্ত্রণের যে আন্দোলন ইদানিং খুব ধুমধামের সাথে চলছে। এটাকে আমাদের দেশে বাস্তবায়ন করার আগে এটা তিনটি কষ্টি পাথরে খুব ভালভাবে যাচাই করে নেয়া উচিৎ।

(১) সর্ব প্রথম আমাদের এটা ভেবে দেখা উচিৎ যে আমরা যে মতবাদটা বাস্তাবায়ন করতে যাচ্ছি তা ইসলামের সে সকল মুলনীতির বিপরীত তো নয় যা মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে একটি নির্ভরযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ পথের দিশা প্রদান করে থাকে?

(২) এরপর আমাদের এটাও চিন্তা করা উচিৎ যে এই আন্দোলনটা বিবেকের বিচারে গ্রহণযোগ্য কিনা?

(৩) এরপর আমাদের আশেপাশে দৃষ্টি মেলেদেখা উচিৎ যে এই মতবাদ কোথাও বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা? যদি হয়ে থাকে তাহলে এর ফলাফল কি বের হয়েছে? তাই আমরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যপারে উক্ত তিনটি বিষয়েই আলাদা ভাবে স্বারগর্ভ আলোচনা করব। যাতে আলোচ্য বিষয়টা অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আমাদের সামনে প্রকাশ পায় যেন কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ না থাকে।

Rb¥ wbqš‡Yi Bmjvgx weavb

ইসলামি শরিয়তের প্রধান ভিত্তি হলো পবিত্র কোরআন শরীফ এবং প্রিয় নবী সাঃ) এর পবিত্র মুখ নিসৃত বাণী তথা আল-হাদীস। জন্ম নিয়ন্ত্রণ কোন নিত্য নতুন বিষয় নয়। বরং বিভিন্ন প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ভাবে সর্বযুগে সর্বদেশেই এর প্রচলন লক্ষনীয়। নববী যুগে তথা কোরআন নাযিলের যুগেও এর বিভিন্ন দিক বিভিন্ন কারণ ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে

আলোচনায় আসে। রাসূল (সাঃ) এর সামনে বিভিন্ন সময় এব্যপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি পবিত্র জবানে এর সুন্দর সমাধান প্রদান করেছেন। একজন মুসলমান তাঁর যাবতীয় সমস্যার সমাধান চাইলে এটাই এর যথার্ত সমাধান। এর আলোকেই কোন বিষয়ের শরয়ী দিক নির্ণয় হতে পারে। পবিত্র কোরআন ও হাদীস গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে উক্ত বিষয়টার দুইটি দিক সামনে আসে।

১) একটি হলো "স্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ"। অর্থাৎ কোন এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা যার দ্বারা সারা জীবনের জন্য লোকটি প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

২) দ্বিতীয়টি হলো "সাময়িক জন্ম বিরতিকরণ।" অর্থাৎ মানুষের মধ্যে প্রজনন ক্ষমতা বহাল থাকা সত্যেও এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা যার দ্বারা সন্তান জন্মানো সাময়িকভাবে বাধা প্রাপ্ত হয়। আমরা এই উভয়টা বিষয়ের ক্ষেত্রে কোরআন হাদীস এর ব্যাখ্যা বিশদভাবে তুলে ধরছি যাতে মাসআলাটা বুঝতেও এর ফলাফল বের করতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

¯vqx Rb¥ wbqšY c×wZ

এর যে পদ্ধতি নববী যুগে প্রচলিত ছিল তা হলো " ইখতেসা" তথা পুরুষ স্বীয় অণ্ডকোষ কর্তণ করে ফেলে দিয়ে যৌন শক্তিকে চিরতরে বিলুপ্তি করে দেয়া।[1] এব্যাপারে হাদীস শরীফে কয়েকটি প্রশ্নের কথা উল্লেখ করা

1 আধুনিক যুগে স্থায়ীজন্ম নিয়ন্ত্রন এর আরো অনেক পদ্ধতি বের হয়েছে, যেমন :
১। নারী বন্ধ্যাকরণ ২। পুরুষ বন্ধ্যাকরণ।
* ভেসেকটমি বা পুরুষ বন্ধ্যাকরণ : পুরুষের অণ্ডকোষের রগ কেটে তার বীর্যের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেওয়া হয়। এতে জীবনে আর বীর্যের কার্যকারিতা ফিরে পাওয়া যায় না।
* লাইগেশন বা নারী বন্ধ্যাকরণ: এটি নারীদের বেলায় প্রযোজ্য। নারীদের জরায়ু হতে শুক্রানু ও ডিম্বানুর সংযোগ টিওবটি কেটে ফেলে দেয়া। এতে শুক্রানু, জরায়ুতে প্রবেশের পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এবং সন্তান ধারনের সম্ভাবনা/ আশা ও চিরতরে শেষ হয়ে যায়।

হয়েছে। যা দরবারে নববীতে উত্থ্যাপিত হয়েছিল। এর একটি ঘটনা ছহীহ বুখারীতে "বাবু মা য়ূকরাহু
মিনাত্তাবাত্তুলে ওয়াল খিসা" অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লা বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, আমরা রাসূল (সাঃ) এর সাথে জিহাদে যেতাম, যৌবনের তাড়নায় যৌন উত্তেজনা আমাদেরকে খুব পেরেশান করত আর এজন্য আমরা রাসূল (সাঃ) এর নিকট 'এখতেসা' তথা অণ্ডকোষ কেটে ফেলার অনুমতি প্রার্থনা করলাম যাতে এই ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে পুরোপুরি জিহাদে মনোযোগী হতে পারি। রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে এর থেকে কঠোরভাবে বারণ করলেন। আর এই কাজ হারাম হওয়ার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের এই আয়াত তিলওয়াত করলেন। " হে মুমিনগণ! তোমরা মহান আল্লাহ কতৃক সে সকল
পবিত্র বস্তু সমূহকে নিজের উপর হারাম করোনা যে গুলি তিনি তোমাদের উপর হালাল করেছেন, আর সীমালংঘন করোনা, কেননা আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেণ না।" উক্ত আলোচনার দ্বারা এটা জানাগেল যে এমন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যার দ্বারা যৌন চাহিদা চিরতরে বিলুপ্তি হয়ে যায়,তা না জায়েজ ও হারাম, চাই এতে যত রকম উপকারিতার কথাই বলা হোকনা কেন, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রাহঃ) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় উল্ল্যেখ করেণ । অর্থাৎ স্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করা সর্ব সম্মতিক্রমে হারাম।

mvgqxK Rb¥ weiZxKiY c×wZ

নববী যুগে এর যে পদ্ধতিটি প্রচলিত ছিল এটাকে 'আযল' (সঙ্গম কালের চরম পূলক মূহুর্তে বীর্য বাইরে ফেলে দেওয়া।) বলা হত।[২] অর্থাৎ এমন

তবে এ যুগে এর অনেক প্রকার আবিস্কৃত হয়েছে, যেমন :- ১। ডায়েফ্রাম বা পেশরী, ২। কনডম ৩। পিল সেবন ৪। নিরাপদ সময়ে স্ত্রী সম্ভোগ ৫। প্লাস্টিক কয়েল বা কপার্টি ৬। **I.V.D** নরফ্লেন্ট ৭। ডিপু বা ত্রৈমাসিক ইনজেকশন ৮। M R ৯। জেলিফর্ম

বিস্তারিত বিবরণ :

১। ডায়েফ্রাম বা পেশরী : স্ত্রীর যৌন ইন্দ্রিয়ে ব্যবহারের জন্য এক ধরনের খাপ বিশেষ।

পদ্ধতি অবলম্বন করা যার দ্বারা প্রজনন উপাদান (বীর্য) জরায়ূতে পৌঁছতে না পারে সে পদ্ধতি পুরুষ অবলম্বন করুক অথবা নারী। এই উভয় পদ্ধতি প্রচীন কাল থেকেই প্রচলিত। কোন কোন সাহাবা কর্তৃক বিশেষ প্রয়োজন মূহুর্তে এমনটা করার প্রমান পাওয়া যায়। আর রাসূল (সাঃ) এব্যাপারে যে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তা ছিল এমন যে এটা যে সম্পূর্ণ নিষেধ তাও বুঝা যায় না। আবার সম্পূর্ণ জায়েজ হওয়ারও উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে এতটুকু বুঝা যায় যে রাসূল (সাঃ) এই কাজটাকে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। এই জন্য পূর্ববর্তী ইমামগণের মধ্যে এব্যাপারে বিভিন্ন মতানৈক্য দেখা যায়। কেউ এটাকে নাজায়েজ মনে করতেন। আবার কেউ বলেন যে এই কাজটা আসলে নাজায়েজ তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা

২। কনডম : পুরুষাঙ্গে ব্যবহারের জন্য এক ধরণের প্লাষ্টিকের খাপ বিশেষ।

৩। পিল সেবন : বানিজ্যিক ভাবে সরবরাহকৃত বিভিন্ন ধরনের বটিকা বা পিল জন্ম নিরোধের জন্য সেবন করা হয়। তবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগনের মতে, এ জাতীয় পিল বা বড়ি সেবনের দ্বারা নারী দেহে মারাত্নক ক্ষতির প্রমান পাওয়া গেছে। যেমন : সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়ে যাওয়া, শরীর ফুলে মোটা হয়ে যাওয়া, মাথার চুল পড়ে যাওয়া, এমনকি মহিলাদের দাঁড়ি গোঁফ গজানোর প্রবল আশংকা রয়েছে।

৪। নিরাপদ সময়ে স্ত্রী সম্ভোগ : স্ত্রীর ঋতু আরম্ভ হওয়ার প্রায় ৮ দিন পূর্বে স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে সন্তান ধারনের তেমন একটা সম্ভাবনা থাকে না। এটাই স্বাভাবিক পদ্ধতি। এতে আধুনিক কোন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়না্ এটাকেই নিরাপদ সময় বলা হয়।

৫। প্লাষ্টিক পর্দা সংযোজন : মেয়েদের গর্ভাশয়ের উপর পর্দা জাতীয় কিছু আরোপ করা বা প্লাষ্টিক কয়েল সংযোগ করে দেয়া। যাতে করে কযেক বছর পর্যন্ত শুক্র ডিম্বাশয়ে প্রবেশ করতে না পারে। এবং সন্তান ধারণ করতে না পারে।

৬। **I.V.D** নরফ্লেন্ট : মহিলাদের বাহুতে মেয়াদ ভিত্তিক নির্ধারিত কিছু কাঠি জাতীয় বস্তু অপারেশনের মাধ্যমে রেখে দেওয়া, মেয়াদ শেষে তা বের করে নেয়া।

৭। ডিপু : জন্ম নিরোধের উদ্দেশ্যে প্রতি তিন মাস অন্তরন্তর মহিলাদের হাতে ইনে্জকশন পুশ করা। যাতে এ তিন মাসের ভেতর নারী অন্তত অনসত্ত্বা হতে না পারে।

৮। M R : এক ধরনের টিউব (মোটা সিরিঞ্জ) ইউরেটাসের ভিতর প্রবেশ করিয়ে তার মাধ্যমে ডিম্বানু ও শুক্রানুকে বের করে দেয়া হয় এটিকে M R বলা হয়। আর তা সাধারণত অন্তসত্ত্বা হওয়ার ২ মাস পনের দিনের ভিতর করতে হয়।

৯। জেলির্ফম : সঙ্গমের পূর্বে ইউটেরাসের ভিতরে জেলির ন্যায় এক ধরনের তরল পর্দাথ রাখা হয়।

জায়েজ আছে। যদি কোন অসৎ উদ্দেশ্যে তা করা হয় তাহলে তা অবশ্যই না জায়েজ হবে। এব্যাপারে হাদীসের ভাষ্য এই ১) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে আমি আমার বাঁদীর সাথে "আযল" করতে চাইলাম অর্থাৎ সাময়িক জন্ম বিরতিকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করতঃ সঙ্গম করতে চাইলাম। (যাতে ঘরের কাজ করতে তার কোন ঝামেলা না থাকে) কিন্তু! প্রিয় নবীজি (সাঃ) কে না জানিয়ে এমনটা করতে মন চাচ্ছিলনা তাই নবীজি (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বললেন:- অর্থাৎ তুমি যদি "আযল" না কর তাহলে এতে কোন ক্ষতিনাই কেননা, কিয়ামত পর্যন্ত যত মানব সন্তান যেভাবে যেভাবে আসার সিদ্ধান্ত হয়ে আছে তা তো বাস্তবায়ন হয়েই থাকবে। (বুখারী মুসলীম)।

২) এই আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এরণ আরেকটা বর্ণনা যে তিনি রাসূল (সাঃ) এর নিকট আযল সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন:- অর্থাৎ সব বীর্য থেকে তো আর সন্তান জন্ম নেয় না। আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন কাউকে সৃষ্টি করতে চান তখন কোন শক্তিই তাকে বাধা দিতে পারে না। (মিশকাত -মুসলীম)

মোট কথা হলো যে বীর্য থেকে কোন মানব সন্তান কে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রেখেছেন সেটা অবশ্যই তার যথাস্থানে পৌঁছে সন্তান জন্ম নিবে। তোমরা যতই বাহানা কর লাভ হবে না।

৩) হযরত জাবের (রাঃ) বলেন যে, এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল:- আমার একটি বাঁদী আছে সে ঘরের সব কাজ করে। আমি আমার জৈবিক চাহিদাটাও তার থেকে পূরণ করি আর এটাও চাই যে তার (গর্ভে)পেটে কোন সন্তান যেন না আসে (যাতে সে ঘরের কাজ ঝামেলা মুক্ত ভাবে করতে পারে) রাসূল (সাঃ) বললেন "ঠিক আছে তুমি তার সাথে 'আযল' করতে চাইলে করতে পার, তবে মনে রেখ তার পেট থেকে যে সন্তান হওয়া আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা অবশ্যই জন্ম নিবে। কিছু দিন পর ঐ ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর দরবারে এসে বলতে লাগল ইয়া রাসুলাল্লাহ! ঐ বাঁদী 'আযল' করা সত্ত্বেও গর্ভবতি হয়ে গেছে। রাসূল (সাঃ) বলেন যে আমি তো আগেই বলে ছিলাম যে, যে বাচ্চা নেওয়ার বিষয়টি ভাগ্যে লেখা আছে সেটা অবশ্যই হবে।

৪) হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন যে এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর নিকটে এসে বলল যে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে আযল করি, রাসুল (সাঃ) বললেন কেন ? তুমি এমনটা করতে যাও কেন ? লোকটি বললঃ আমার একটি বাচ্চা আছে যাকে সে দুধ পান করায়, এখন যদি আবার সে গর্ভবতি হয়ে যায় তাহলে তো এই বাচ্চাটার কষ্ট হবে, দুধ পাবে না। রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন যে পারস্য ও রোম দেশের লোকেরা তো এমন করে থাকে, তাদের বাচ্চাদেরতো কোন সমস্যা হয়না! (মুসলিম)

এই চারটি হাদিস দ্বারা জানা গেল রাসূল (সঃ) এই কাজটিকে পছন্দ করেণ নাই তবে স্পষ্টভাবে নিষেধও করলেন না।

৫) হযরত জাবের (রাঃ) হতে আরেকটি বর্ণনা আছে তিনি বলেন যে, আমরা সে সময় আযল করতাম যে সময় কোরআন নাযিল হত। আযল করা যদি নাজায়েজ হত তাহলে কোরআনে এব্যাপারে কোন স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আসত। যেহেতু এব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা আসে নাই তাহলে বুঝাগেল এই কাজটা জায়েজ আছে। এই হাদীস বুখারী মুসলীম উভয় কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম শরীফে একথাও উল্যেখ করা হয়েছে যে, আমাদের আযল করার বিষয়টি রাসূল (সাঃ) জানতেন কিন্তু তিনি তা নিষেধ করেণনি।

৬) কিন্তু জুযামা বিনতে ওয়াহাব হতে বর্ণিত হাদীস যা মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, এতে আছে কিছু লোক রাসূল (সাঃ)থেকে আযল এর ব্যাপারে জানতে চাইলে রাসূল (সাঃ) বললেন যে,"এটাতো হলো ওয়াদে খফি তথা সন্তানকে হত্যাকরে ফেলার সূক্ষ পন্থার অন্তর্ভুক্ত। যার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন যে দিন (হাশরে) প্রশ্ন করা হবে সন্তানদের জীবিত অবস্থায়দাফন করে দেয়ার ব্যাপারে।" (মেশকাত ২৭) এই শেষ হাদীসে স্পষ্টভাবে এই কাজের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এবং এটা যে হারাম তা বর্ণিত হয়েছে। এই কাজকে সন্তান হত্যার মত জঘন্য অপরাধের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে । হাদীসের শেষাংশে রাসূল (সাঃ) আরও বলেছেন "এমন জঘন্য কাজ মুসলমানরা করতে পারে তা আমি ভাবতেও পারিনি।" (ফাতহুল কাদীর)

৭) কিন্তু এর বিপরীত হাদীস ও হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে আর তা হলো, তিনি বলেন যে “আমি রাসূল (সাঃ) এর নিকট জানতে চাইলাম যে আমরা আমাদের বাঁদীদের সাথে আযল করতাম কিন্তু কতিপয় ইয়াহুদী আমাদের বলল যে এটা সন্তানকে হত্যা করার ছোট পন্থা। রাসূল (সাঃ) তা শুনে বলেন যে ঐ ইহুদী ভূল বলেছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা যখন কোন মানব সন্তানকে সৃষ্টি করতে চান তখন একে কেউ বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাখেনা। (তিরমিযি)।

বাহ্যিকভাবে এই হাদীস হযরত জুযামা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের বিপরীত মনে হয় সেখানে তো রাসূল (সঃ) নিজেই আযল করাকে ‘ওয়াদে খফি’ বলেছেন, আর এখানে ইয়াহুদীর কথাকে ভুল বলেছেন। আসলে এই দুইটার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। কারণ ইয়াহুদী এটাকে সন্তান জীবন্ত দাফন করে দেয়ার এক প্রকার হিসেবে আখ্যায়িত করছেন। তবে পার্থক্য কেবল ছোট বড় হিসেবে। অর্থাৎ কোরআনে বর্ণিত ‘ওয়াদে খফি’ এর মধ্যে জীবন্ত দাফন করার বিষয়টা বড় দাফন হিসেবে ধরা হচ্ছে। আযল করাকে ছোট দাফন হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু রাসূল (সাঃ) আযল করাকে সন্তান জীবন্ত দাফন করা হিসেবে আখ্যায়িত করেণনি। বরং ‘ওয়াদে খফি’ বলে এই কথার দিকে ইংগিত করেছেন যে যদিও আযল করা বাহ্যিকভাবে সন্তানকে জীবন্ত দাফন করা বুঝায়না। কিন্তু সে যুগে যে কারনে (দারিদ্রতার ভয়ে) মানুষ নিজ সন্তানকে জীবন্ত দাফন করে ফেলত এ যুগেও যদি কেউ আযল বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ এই উদ্দেশ্যে (দারিদ্রতার ভয়ে) করে তাহলে তার ও সন্তান দাফন করে ফেলার সমান গুনাহ হবে। তাহলে দেখা গেল হযরত জুযামা (রাঃ) এর বর্ণনা পিছনের অন্য কোন হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক থাকলো না। তথাপি কিছু বৈপরিত্ত লক্ষ্যনীয়,কেননা এই হাদীসে আযল করাকে স্পষ্ট নিষেধ করেছেন কিন্তু অন্য কোন হাদীসে এত স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়নি। এখন এই উভয় প্রকার বর্ণনাকে (আযল জায়েজ হওয়া অথবা নাজায়েজ হওয়ার) একত্র করে এর মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ নিরসন কল্পে প্রখ্যাত হক্কানী উলামাগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তম্মধ্যে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতামতটি হলো এই যে,হযরত জুযামা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা আযল করা

মাকরুহ বুঝা যায়। আর অন্য সব বর্ণনামতে আযল করা জায়েজ বুঝা যায়। এখন সব হাদীস একত্র করলে যে নির্জাস বের হয় তাহলো আযল তথা সব ধরনের সাময়িক জন্ম বিরতিকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যদিও জায়েজ তবে অবশ্যই মাকরুহ তথা প্রিয় রাসূল (সাঃ) এর কাছে অগ্রহণযোগ্য ও অপছন্দনীয় কাজ। এর স্বপক্ষে দলীলও রয়েছে কেননা আযল জায়েজ হওয়ার যত গুলি বর্ণনা উল্লেখ করা হলো সবগুলোর সারকথা এটাই দেখা যাচ্ছে যে, আযল করার প্রতি রাসূল (সঃ) কাউকে উৎসাহ তো প্রদান করেণনি বরং অপছন্দ ও নিরুৎসাহিত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ঠ লক্ষ্য করা গেছে। তবে স্পষ্টভাবে নিষেধও করা হয়নি। এর সারকথা এটাই বের হয় যে আযল করা জায়েজ হলেও তা অপছন্দনীয় তো বটেই। আর হযরত জুযামা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস ও একথার প্রমাণ বহন করে যে আযল করা মাকরুহ কেননা বীর্যপাত করাকে বাস্তবে মানব সন্তান হত্যার সমান অপরাধ কিছুতেই নির্ধারণ করা যেতে পারেণা। বাস্ত বে মানুষ হত্যা করা হারাম হলে, বীর্যপাত করে সন্তান হওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা বড়জোর মাকরুহ বলা যেতে পারে। সাহাবা ও তাবেঈনদের এক বিশাল জামাত এই মতের পক্ষে ছিলেন। আল্লামা বদ্দরুদ্দীন আঈনী (রাহঃ) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেছেন "সাময়িক জন্মবিরতিকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করাকে হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হযরত আবু উমামা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবাগণ মাকরুহ বলেছেন। তাবেঈনগণের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম নাখঈ, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ এবং তাউস (রাহঃ) বলেন যে আযল করা মাকরুহ। এসকল হাদীস এর বর্ণনা দেখার পর অধিকাংশ ফকীহগণ ও এইমত পোষন করেছেন যে আযল করা মাকরুহ। যেমনটা ফাতহুল ক্বাদীর রাদ্দুল মুহতার, ইহয়াউল উলুম প্রমূখ গ্রন্থে স্পষ্ট লেখা আছে।

‡h mKj Ae¯vq Rb¥wbqšY Rv‡qR !

তবে হ্যাঁ কোন ধরণের অপরাগতা ও বিশেষ অসুবিধা থাকলে সেটা ভিন্ন কথা তখন সেই প্রয়োজনের কারণে মাকরুহটা জায়েজ হয়ে যাবে। যার বিস্তারিত বিবরণ ফতুয়া শামীতে উল্লেখ রয়েছে। যেমন কোন মহিলা যদি এত দূর্বল হয় যে গর্ভধারণের ক্ষমতা তার নাই। অথবা দূর দেশের সফরে আছে অথবা এমন কোথাও আছে যেখানে বেশিদিন থাকার ইচ্ছা নেই সেখানে তারা সন্তান ধারণ করতে চাচ্ছেনা অথবা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি মনোমালিন্যতা দেখা দেয়, দাম্পত্য জীবন ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়। তাহলে এসকল ব্যক্তিগত অপারগতার ভিত্তিতে সে সকল ব্যক্তি বিশেষের জন্য সাময়িক জন্ম বিরতিকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করার অনুমতি আছে। এসকল সমস্যা দূর হয়ে গেলে তাদের জন্যও আর এটা করা জায়েজ হবেনা। এমনিভাবে সর্ব সাধারনের জন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবে এর ব্যাপক প্রচলন করে দেয়া অবশ্যই মাকরুহ হবে যা বর্জণীয়, নিষেধ। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, কেউ ব্যক্তিগত ভাবে কোন এমন উদ্দেশ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করল যা ইসলাম পরিপন্থি। তাহলে তার একাজ কিছুতেই জায়েজ হবেনা। যেমন কেউ মনে করল যে যদি আমার মেয়ে হয় তাহলে লোকে মন্দ বলবে। লোক সমাজে মুখ দেখাব কিভাবে? এই জন্য সে আযল ইত্যাদি করল তাহলে তার এই কাজ জায়েজ হবেনা। কেননা তার এই উদ্দেশ্য অসৎ, পবিত্র কোরআনে এহেন উদ্দেশ্যকে বিভিন্ন স্থানে তিরস্কার করা হয়েছে। এমনিভাবে কেউ যদি দারিদ্রতার ভয়ে এমনটা করে তাহলে তার এইটাও জায়েজ হবেনা তার এই উদ্দেশ্য ইসলামের মৌলিক বিধানের পরিপন্থি।

মোট কথা, জন্ম নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী এমন সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা যার দ্বারা প্রজনন ক্ষমতা একেবারে বিলুপ্তি হয়ে যায়, আর সেটা পুরুষ গ্রহণ করুক অথবা নারী, কোন ঔষধ, ইন্‌জেকশনের মাধ্যমে হউক অথবা অপারেশন অথবা এজাতীয় কোন অন্য পন্থা গ্রহণ করা প্রিয় নবীজি (সাঃ) এর হাদীসের আলোকে সম্পূর্ণ না জায়েজ ও হারাম। আর সাময়িক জন্ম

বিরতিকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করা যেমন আযল করা কোন ঔষধ, টেবলেট, কনডম, ইন্‌জেকশন নেয়া অথবা অন্য কোন কৃত্রিম পদ্ধতি অবলম্বন করা সেটা ব্যক্তি বিশেষ, কোন বিশেষ প্রয়োজন ও অপারগতার মূহুর্তে সে প্রয়োজন অনুসারে তা ব্যবহার করা জায়েজ আছে। তবে সেটাও কোন অসৎ উদ্দেশে যেন না হয়। কিন্তু তাই বলে এই
পদ্ধতিকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবে ব্যাপক প্রসার ঘটানো ইসলাম পরিপন্থি কাজ। আর এই পদ্ধতি অবলম্বন করাকে দেশ ও জাতির উন্নতি, প্রগতির সোপান আখ্যায়িত করা, যেটাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) কোন জাতি ও দেশের জন্য ক্ষতিকারক ও অপছন্দ করেছেন, কিছুতেই জায়েজ হতে পারেণা। বিশেষ করে এটাকে এই কারণে যদি করা হয় যে দারিদ্রতা ও অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় এটা বিরাট সহায়ক হবে। তাহলে তা হবে আরও দুঃখজনক। কেননা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক তাঁর সুনিপূন দক্ষতা ও বিচক্ষণ প্রতিপালন ক্ষমতায় মানুষ সহ সকল প্রাণীকুলের রিজিকের দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়েছেন এবং যথাযথ পালন করে যাচ্ছেন, এখানে কারো কোন দখল বা সহযোগিতার প্রয়োজন পড়েনা। বর্বর যুগে আরবের সেই দারিদ্র লোকগুলো যারা স্থায়ী অভাব অনটনের ভয়ে নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলত তাদের সেই ভ্রান্ত ধারণাকে খণ্ডন করতে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন যে তোমাদের এই কাজ আমার অপার ক্ষমতার প্রতি অযথা সন্দেহ পোষণ এবং আমার কর্মসূচির উপর হস্তক্ষেপ বটে। অথচ আমি তো শুধু মানুষের রিজিকের যথাযথ ব্যবস্থা অনায়াসেই করে রেখেছি নিজ দায়িত্বে। "এই বিশ্ব ভুমণ্ডলে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিকের দায়িত্বভার আল্লাহর উপর ন্যস্ত নেই। তিনি এটাও জানেন যে কোন প্রাণী কখন কোথায় থাকবে বা যাবে এবং সেখানে তার রিযিকের ব্যবস্থা কিভাবে করা হবে।"(সুরা হুদ-৬) এই আয়াতে এবং এই জাতীয় অনেক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেন যে তিনি যতগুলো প্রাণী পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন তাদের সকলের নিত্য প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী যথাস্থানে যথাযথ ভাবে ব্যবস্থা করে থাকেন। তিনি এও বলেন যে যার যার নির্ধারিত রিযিক সে সাথে করে নিয়ে যেতে হবেনা। বরং মহান প্রভু নিজ দায়িত্বেই বান্দার

গন্তব্যস্থলে বান্দা যাওয়ার পূর্বেই তা সেখানে পৌঁছে দিয়ে থাকেন। সে রিযিক বান্দাকে পেতে কোন প্রকার ঝামেলা পোহাতে হবেনা। তাঁর ভাষায় অর্থাৎ মহান প্রভু প্রাণীদের স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা যেমনিভাবে জানেন ঠিক তেমনিভাবে প্রাণীদের অস্থায়ী বা ভবিষ্যতের ঠিকানাও জানেন। এবং সবখানেই তাদের রিযিক যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়ে থাকেন। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন "এমন কেউ নেই যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই। আর আমি এর থেকে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে রিযিক অবতীর্ণ করে থাকি।" (সুরা হিজর-২১)[৩]

এই আয়াতের উপর বিশ্বাসী বান্দাকে এটাও মানতে হবে যে মহান আল্লাহ তায়ালা কোন একটি প্রাণীকেই চিন্তাভাবনা ছাড়া (কোন পরিকল্পনা ছাড়াই) এমনিতেই সৃষ্টি করে দুনিয়াতে ছেড়ে দেন নাই। যে এগুলির অন্ন-বস্ত্র,বাসস্থানের চিন্তা মহান প্রভূর নেই এগুলির জন্য অন্য কেউ ভাবতে হবে বা পেরেশান হতে হবে। আর যদি কেউ এমন মনে করে যে সৃষ্টিকর্তা এই সকল সৃষ্টিজীব সৃষ্টি করে এমনিতেই ছেড়ে দিয়েছেন আর এসবের

---

[3] নোট : এছাড়াও এর স্বপক্ষ্যে পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত ও দলিল রয়েছে, যেমন -

৩) আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁর কাছেই, তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন,পরিমিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী। (সুরা শুরা-১২)

৪) তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্রতার ভয়ে হত্যা করোনা। আমি তাদেরকে রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও দেই। নিশ্চই তাদের হত্যা করা গুরুতর পাপ। (বনি ইসরাঈল-৩১)

৫) নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তারা। যারা নিজেদের সন্তানদেরকে নিছক নির্বোধের ন্যায় প্রমান ব্যতীরেকে না বুঝে হত্যা করেছে এবং যে বস্তু আল্লাহপাক তাদেরকে দিয়েছিলেন, তা হারাম করে নিয়েছে। কেবল আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। নিশ্চয়ই এরা গোমরাহীতে পতিত হয়েছে এবং কখনো সুপথগামী হয়নি। (আনআম-১৪০)

৬) আল্লাহর অধিকারে আছে আসমান জমিনের ভান্ডার সমূহ, কিন্তু মুনাফেকরা বুঝে না। (মুনাফিকুন-৭)

৭) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা প্রচুর জীবিকা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে মুমিনদের জন্য। (রোম-৩৭)

৮) আর অনেক প্রাণী এমন রয়েছে, যারা আপন খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করে রাখে না। আল্লাহই তাদের জীবিকা পৌছিয়ে থাকেন এবং তোমাদেরকেও পৌছাঁন এবং তিনি সব কিছু জানেন এবং শুনেন। (আনকাবুত-৬০)

কোন খোজ খবর তিনি রাখেন না সৃষ্টিজীব দিন দিন বাড়ছে কিন্তু দেশ বা আবাদ ভূমি তো আগের মতই সীমিত রয়ে গেছে। জীবন ধারনের মত সকল উপকরণতো সীমিত ও স্বল্প পরিসরেণ রয়ে গেছে। এসবের কোন খোঁজখবর স্রষ্টা না রেখে খালি সৃষ্টিজীব দুনিয়াতে পাঠিয়েই যাচ্ছেন (না উজুবিল্লাহ) তাহলে তা মারাত্বক অন্যায়, মহাপাপ, এমনকি ঈমানও চলে যেতে পারে। তিনি তো এমন দয়াময় যে কোন প্রাণী দুনিয়াতে আসার পূর্বেই তার থাকা খাওয়াসহ জীবন উপকরণের যাবতীয় ব্যবস্থা সুনিপূনভাবে করে রেখেছেন। মায়ের গর্ভে থাকাকালীন গর্ভনালীতে এবং ভুমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে মায়ের বুকে অলৌকিক ভাবে তার খাদ্যের সুব্যবস্থা করে রেখেছেন। এরপর সে দিন দিন যত বড় হচ্ছে তার চাহিদা অনুসারে বিচিত্র সব খাদ্য দ্রব্য তার সামনে উপস্থিত করে যাচ্ছেন।[৪] শ্রষ্টার এই সুনিপূন ব্যবস্থাপনা শুধু কি মানব জাতির জন্যই প্রযোজ্য (?) না বরং গহীন জঙ্গলে বিচরণকারী প্রত্যেকটি প্রানীর ক্ষেত্রেও শ্রষ্টার একই বিধান চালু রেখেছেন। যখন যে প্রাণীর প্রয়োজন চাহিদা অনুসারে সেই প্রাণীর সৃষ্টি উৎপাদন তিনি বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন। আবার যখন এর চাহিদা কমে যায় তখন এর উৎপাদন অলৌকিকভাবে হ্রাস করে দেন। গত শতাব্দীতে পেট্রোলের কোন অস্তিত্য পৃথিবীতে ছিলনা এর উৎপাদন ও ছিল না। আজকের এই প্রগতিশীল দুনিয়ায় প্রেট্রোল এক অপরিহার্য অংশ। তাই

---

১) মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর অপার শক্তিতেই বান্দার সামনে এই খাবার হাজির করেন। প্রতিটি খাদ্য কণা যা মানুষের কণ্ঠ হয়ে উদরে যাচ্ছে- এ একমাত্র তাঁর অনুগ্রহ। আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন শক্তির বিশাল পথ পাড়ি দিয়ে এই খাবার অস্তিত্ব লাভ করেছে। এই খাবার তৈরি করতে গিয়ে সূর্য তার নিজেকে জ্বালিয়েছে। চাঁদ তাতে শীতলতা ঢেলে দিয়েছে। শিশির এই খাদ্যের উপর নিজেকে উৎসর্গ করেছে। মাটি তার বুক বিদীর্ণ হওয়ার কষ্টকে বুক পেতে নিয়েছে। মেঘ সমুদ্র থেকে পানি তুলে এনে পৌঁছে দিয়েছে। বাতাস সেই মেঘকে বৃষ্টি করে খাদ্যের কণায় কণায় ছড়িয়ে দিয়েছে। অতঃপর মহান আল্লাহর অসীম কুদরতে সৃষ্ট এই খাদ্য কণিকার কোনটি মিষ্টি,কোনটি নোনা আবার কোনটি টক। এগুলোর রং বিচিত্র, বিচিত্র তার স্বাদ। সব মিলিয়ে কুদরতের এক বিস্ময়কর বাগিচা। অতঃপর মানুষের উদর জগত এবং তার হজম ব্যবস্থা সেও এক শিক্ষণীয় বিষয়। মহান মালিক ও দয়াময় প্রতিপালক এভাবেই সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সর্বকালে, সবর্ত্র প্রত্যেকের জন্য রেখেছেন এই অগাদ ব্যবস্থাপনা।

ভুমিও এর খনিজ সমূহকে উম্মুক্ত করে দিয়েছে। এমনিভাবে ভূমির আবাদীর কথা বলতে গেলে দেখা যায় যে এক সময় পৃথিবীর ৪ ভাগের একভাগ মাত্র বসবাসের ও ফসলাদীর জন্য ব্যবহৃত হত আর বাকি অংশ পাহাড় পর্বত বন অরণ্য মরুভূমি ইত্যাদীতে হাজার হাজার মাইল অনাবাদী হিসেবে পড়ে ছিল। কিন্তু যখন জনসংখ্যা বাড়তে লাগল সেই সাথে এর প্রয়োজন অনুপাতে সেই অনাবাদী জমি গুলি আবাদ হতে লাগল আর এখনো পৃথিবীর এমন অনেক স্থান রয়েছে যেখানে প্রচুর লোক আবাদ হতে পারে যার বাস্তবমুখি কিছু প্রামান্য তথ্য আমরা সামনে তুলে ধরতে প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। এছাড়াও কুদরতি লিলাখেলায় দুর্ঘটনা সমূহের এমন সব অলৌকিক ব্যবস্থাপনা করে রেখেছেন যা চিন্তা করে কোন কূল কিনারা পাওয়া যায়না। যে দ্রুত গতিতে পৃথিবীতে জনসংখ্যা বাড়ছে সেই গাণিতিক হারে বিভিন্ন দুর্ঘটনাও ঘটে চলেছে অনবরত। পৃথিবীর শুরু হতে অদ্যাবদি সকল দুর্ঘটনা ও যুদ্ধে যত মানুষ নিহত হয়েছে তা ১৯১৪ ইং সনের বিশ্ব যুদ্ধে তার চেয়ে বেশী লোক নিহত হয়েছে এছাড়াও ঘুর্ণিঝড়, বন্যা, (সুনামী, সিডর) মহামারি, বাস, ট্রেন, বিমানের মুখোমুখি সংঘর্ষ ইত্যাদীতে কত লোক অহরহ নিহত হচ্ছে তার হিসাব কে রাখে আর এত কঠোর নিরাপত্তা ও সাবধানতা সত্যেও পৃথিবীর কোন শক্তি এগুলি প্রতিহত করতে পারছে কি?

মোট কথা হলো এগুলো সবই সেই মহা ক্ষমতাধর বিশ্বপতির কার্যক্রম যাতে কারো কোন হাত নেই। তিনি সৃষ্টি করছেন আবার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণও সেই অনুপাতে করে যাচ্ছেন। সৃষ্টি করার পর সে কোথায় থাকবে? কি খাবে? এসকল দায়িত্বও তিনি নিজেই যথার্ত ভাবে পালন করে যাচ্ছেন। এতে কোন ব্যক্তি, রাষ্ট্র, সংগঠন, বা জনগণের কোন সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেণ না। মানুষের আবিস্কৃত যন্ত্র সমূহের কাজ শুধু এই যে একটা সীমিত পরিসরে জমিনের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহযোগীতার চেষ্টা করা উৎপাদিত ফল-ফসল ইত্যাদী নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে যন্ত্রের যাহায্যে (ফ্রিজ-হিমাগার ইত্যাদীর সাহায্যে) হেফাজত করা। অর্জিত সম্পদের ইনসাফ ভিত্তিক সুবন্টন নির্ধারণ করা। আবাদী জমীনের ইনসাফ ভিত্তিক সুবন্টন করা। অনাবাদী জমিনগুলো

খোদাপ্রদত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহযোগিতায় আবাদ করার চেষ্টা করা। যদি মানুষের যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় স্বীয় দায়িত্ব সমূহ যথার্তভাবে পালন করতে তৎপর থাকে তাহলে একথা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে পৃথিবীর মানুষ কোন কালেই জীবনোপকরনের সংকটে পড়বে না। কিন্তু নির্মম বাস্তবতা হলো এই যে, মানুষ তার স্বীয় করণীয় কাজ বাদ দিয়ে মহান শ্রষ্টার কর্ম পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করার চিন্তা ভাবনায় ব্যস্ত। মানুষের এহেন কর্মকাণ্ড বিবেকের বিচারে যেমন চরম ভুল, অভিজ্ঞতার আলোকেও এর অসারতা সর্বজন বিধিত। যে শ্রষ্টার বিপরীত গিয়ে মানুষের যত চেষ্টা মানুষকে শান্তি, নিরাপত্তা সুস্থতা, স্থিরতা করেছে তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ প্রমানিত হয়েছে। মোট কথা, জন্ম নিয়ন্ত্রণকে দেশ ও জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রসার ঘটানো এবং এটাকে উন্নতি, প্রগতির সোপান হিসেবে দেখা সেটা শ্রষ্টার অপার ক্ষমতাময় কর্মসূচিতে হস্তক্ষেপ করার শামিল ও রাসূলের সুন্নতের পরিপন্থি। যা কোন মুসলমান করার কল্পনাই করতে পারেণা। সেটা আবার সফলতা ও উন্নতির সোপান কি করে হয়?

এই জঘন্য কাজ থেকে আল্লাহ তার অপার করুণায় মুসলমানদেরকে হেফাজত করুন। আমিন॥

weţe‡Ki wePv‡i Rb¥ wbqšY

আমরা একথা যখন জানতে পারলাম যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ ইসলামী বিধানের পরিপন্থি তখন সুস্থ বিবেকের দাবি তো হলো এই যে বিষয়টার এখানেই নিস্পত্তিকরা আর কোন যুক্তির আশ্রয় না নেয়া। কেননা ইসলামতো হলো একটি সর্বজনীন ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এর কোন একটি বিধান ও কোন মানুষের কল্পনা প্রসূত নয় বরং এমন এক মহা মহিম, রাজাধিরাজ আল্লাহর প্রদত্ত বিধান, যার কুদরতি হাতের নিয়ন্ত্রণে পৃথিবীর সব কিছু রয়েছে। আর প্রত্যেকটি বিধান মানুষের বিবেকের সম্পূর্ণ অনুকূলে ও যুক্তি যুক্ত। এবং সুক্ষ্যাতিসুক্ষ্য হেকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাস স্বাক্ষী যে ইসলামের কোন বিধানই এমন যায়নি যা মানুষের সুস্থ বিবেকের পরিপন্থি হয়েছে। তাই ইসলামের বিধান কোন সুস্থ্য বিবেকের পরিপন্থি নয়। কিন্তু!

যে সকল বোকা লোক ইসলামের কোন বিধানের সাথে যুক্তির অমিল দেখে থাকে তাদের বুঝার সুবিধার্থে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়টার একটা যুক্তিপূর্ণ পর্যালোচনা তুলে ধরছি।

১) পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যদি ইতিহাসের দিকে একটু দৃষ্টি দেয়া যায় তাহলে এই নির্মম বাস্তবতাটা আমাদের সামনে সহজেই ভেসে উঠে যে, সর্বদা চাহিদার অনুপাতেই উৎপাদন প্রচলিত রয়েছে। যখন যে পরিমানের প্রয়োজন সামনে এসেছে সে অনুপাতেই পন্য সামগ্রীর উৎপাদন হয়েছে। যখন পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী লোক সংখ্যা কমছিল । যখন মানুষের বসবাস পৃথিবীর একটি নির্ধারিত অংশে সীমিত ছিল, তখন যোগাযোগের জন্য একটি সাইকেলের আবিস্কারও কেউ করেনি। তাই সে যুগে না বিমান ছিল না সামুদ্রিক জাহাজ ছিল, না রেল, বাস, বা কোন মোটরযান ছিল। তখনকার লোকজন যদি এই চিন্তা করে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে লিপ্ত হয়ে যেত যে,যে হারে মানুষ বাড়ছে, সে হারে আবাদ ভূমিতো বাড়ছেনা, জীবনোপকরনের অন্য কোন সামগ্রীও তো বাড়ছে না। আর খাদ্যদ্রব্য তো এই পরিমানে গোদামজাত করা নেই যে আগামিতে কোটি কোটি মানব সন্তান এসে খেতে পারে । এবং না দূর দূরান্তে সফর করার জন্য কোন দ্রুত যানবাহনও আছে। তাই এখন থেকেই যদি জন্ম নিয়ন্ত্রণ না করা হয় তাহলে আগামী দিনের পৃথিবীটা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ সংকটময় ও সংকীর্ণ। যেমনটা এ যুগের কোন কোন বুদ্ধিজীবি চিন্তা করতে করতে মাথার চুলগুলো ফেলে টাক করছেন। তাহলে আরও হাজার বছর পূর্বেই পৃথিবীতে বসবাসের মত লোক পাওয়া যেতনা। পৃথিবীর গতি থমকে দাড়াত। কিন্তু! তখনকার লোকগুলো এই মারাত্মক ভূলটা করে নাই। তারা মহান আল্লাহর কুদরতের উপর পূর্ণ আস্থা ও অগাধ বিশ্বাসী ছিল। তারা জানত যদি জনসংখ্যা বাড়ে তাহলে শ্রষ্ঠা এর চাহিদা মোতাবেক অন্ন,বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা ও বাড়াবেন। আর বাস্তবে হলোও তাই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রয়োজন অনুপাতে জীবনোপকরণের সকল সামগ্রীও বৃদ্ধি হতে লাগল। মহান আল্লাহ তায়ালার কুদরতী খেলাও এটাই যে, যে পরিমানের প্রয়োজনাদী সামনে আসে সেই মোতাবেক সমাধানও তিনি করে থাকেন। শুধু তাই নয় বরং যখন কোন জিনিষের

চাহিদা কমে যায় তখন সে জিনিষ ক্রমান্নয়ে বিলুপ্ত হতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে যখন যাতায়াতের জন্য আজকেরমত বিমান, রেল, বাস, জাহাজ ইত্যাদী কোন দ্রুতগামী মোটরযান ছিলনা তখন মানুষ ঘোড়া, উট, ইত্যাদী দ্বারা যাতায়াতের উপর নির্ভরশীল ছিল। আর তাই তখন ঘোড়ার উৎপাদন ছিল প্রচুর পরিমানে। কিন্তু যুগের বিবর্তনে যখন মানুষ মটরযানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল, তখন ঘোড়ার চাহিদা আস্তে আস্তে কমে যেতে লাগল। কমে গেল এর ব্যবহারও! এখন যুক্তির বিচারে এমনটাই তো হওয়া উচিৎ ছিল যে যেহেতু ঘোড়ার ব্যবহার কমে গেছে তাই সে সকল ঘোড়া ও এদের বংশধররা প্রচুর হতে হতে কুকুর বিড়ালের ন্যায় অলি গলিতে ঘুরে বেড়াত। আর কল্পনাতীত মূল্যহ্রাস হওয়ার কথাছিল। কিন্তু; বাস্তবে হল কি? ঘোড়ার সংখ্যার দিক থেকে বৃদ্ধি পাওয়া তো দুরের কথা! অবাক হওয়ারমত হ্রাস পেয়েছে। এমনিভাবে মূল্য হ্রাস হওয়াতো দুরের কথা অভাবনীয়ভাবে দাম বেড়েছে। বেশি দুরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার দেখা নিজের অভিজ্ঞাতার কথাই বলছি। ভারতে প্রথমে গরু জবাই করা রাষ্ট্রীয় আইনে বৈধ ছিল। প্রত্যেক দিন সারা ভারত ব্যাপী প্রায় লক্ষাধিক গরু জবাই হত। এর কিছুদিন পর যখন রাষ্ট্রীয় আইনে তা নিষেধ হয়েগেল, যার দরুণ দৈনিক লক্ষাধিক গরু জবাই হওয়ার থেকে বেঁচে যেতে লাগল। সেই অনুপাতে যদি সঠিক হিসাব করে দেখা হয় তাহলে এতদিনেতো ভারতে মানুষের সমান সমান গরু বাছুরে ভরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে তাই কি হয়েছে? কক্ষনো নয়। কিভাবে হবে? এটাতো হলো বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার দক্ষ হাতের কারিগরী, মানুষের চিন্তা ও যেখানে পৌঁছা অসম্ভব। এটাতো এমন নিপূন কার্যক্রম, যেথায় সকল মাখলোকের মাথা নত হয়ে আসে। হিসাব নিকাসের সকল ক্যালকোলেটর যেখানে অকেজো। তাহলে এটা কি করে মাথায় আসে যে জনসংখ্যা বাড়লে জীবনোপকরনের সামগ্রী সংকীর্ণ হয়ে যাবে? বরং বাস্তবতা হলো যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী সেই অনুপাতে বাড়তে থাকবে যেমনটা পূর্বথেকে চলে আসছে। মহান আল্লাহ তায়ালা এই সীমিত পৃথিবীতে এমন অসংখ্য প্রাণী সৃষ্টি করেছেন যার একটি অথবা এক জোড়ার জন্ম হার যদি কয়েক প্রজন্ম

পরিপূর্ণ ভাবে হতে দেয়া হয় তাহলে অতি অল্পদিনে দেখা যাবে পৃথিবী এরাই দখল করে নিয়েছে। অন্য কোন প্রাণীর সংকুলান আর হবে না। যেমন ‘ষ্টার ফিস’ একসাথে বিশ কোটি ডিম দেয়। যদি একটি ষ্টার মাছ কে স্বাধীনভাবে তার বংশ বিস্তারে সুযোগ দেয়া হয় তাহলে মাত্র ৩/৪ প্রজন্ম পার হতে না হতেই সাগর মহা সাগরে শুধু কেবল ষ্টার মাছেই ভরে যাবে অন্য কোন প্রাণী থাকবে তো দুরের কথা সাগরে পানিও পাওয়া যাবে না। কিন্তু কোন সে কুদরত যিনি এই সকল প্রাণীদেরকে একটা নির্দিষ্ট পরিসর ছাড়া এর বাইরে বাড়তে দিচ্ছেনা সেটা অবশ্যই আমাদের এযুগের বিজ্ঞান যা সাইন্টিফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নয়। সেই নিয়ন্ত্রণ শক্তি একমাত্র মহান আল্লাহর কুদরতি শক্তি। তাহলে যে খোদায়ী কুদরতি শক্তি সে সকল প্রাণীদেরকে এদের নির্দিষ্ট পরিধিতে সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন ঠিক তেমনিভাবে তাঁর সেই অপার ক্ষমতা মানুষের প্রজননের ক্ষেত্রেও কার্যকরি হবে। সর্বদা তাঁর সেই কর্মসূচী অনুযায়ী চলে আসছে আর এভাবেই চলতে থাকবে। তাহলে আমাদের কি প্রয়োজন পড়ল তাঁর সেই খোদায়ী কাজে হস্তক্ষেপ করার?

৩) দ্বিতীয় বিষয়টি হলো জন্ম নিয়ন্ত্রণ চাই যেভাবেই করা হোক না কেন এটা একটা প্রকৃতি বহির্ভূত কাজ, কেননা দাম্পত্য জীবনের মূল লক্ষই হলো প্রজনন ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা। যা বিশেষত নারীদের দৈহিক গড়ন ও তা পর্যায়ক্রমে বর্ধনশীলতার পরিবর্তনের প্রতি গভীর দৃষ্টি দিলেই বুঝে আসে। মনে হয় যেন সৃষ্টিকর্তা নারীদের দেহটাকে সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য এক মেশিনারী যন্ত্রের ন্যায় উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। তার কাজই হলো সন্তান জন্ম দেয়ার মাধ্যমে মানুষের অস্তিত্য পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখতে ভুমিকা রাখা। নারী সাবালিকা হওয়ার সাথে সাথে তার মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হয়ে যায়। এটা যেন তাকে প্রতি মাসেই প্রজনন কাজের জন্য প্রস্তুত করছে। এরপর যখন তার পেটে সন্তান আসে তখন তার দেহে এক বিশেষ পরিবর্তণ লক্ষ করা যায়। আগন্তুক সন্তানের দেহ গড়ন বর্ধনের প্রভাব তার দেহে পড়তে থাকে,নারীর দৈহিক সৌন্দর্য দিন দিন ম্লান হতে থাকে।

তার খাদ্যাভ্যাস থেকে কেবল প্রাণ রক্ষা হওয়ার মত অংশ তার দেহের জন্য ব্যয় হয়, আর বাকি সবটুকু অংশ সন্তানের দৈহিক অবকাঠামো তৈরীর জন্য ব্যয় হতে থাকে। আর এ থেকেই মায়ের হৃদয়ে সন্তানের জন্য দয়ামায়া,স্নেহ-মমতা,ত্যাগ,আবেগ,ভালবাসার জন্ম নেয়। সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর নারীর দেহে আরেকটি পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় যা তার সন্তানকে দুধপান করতে সহায়ক। আর সে সময় মায়ের দেহে খাদ্যাংশ ও রক্ত হতে যে নির্জাস হয়ে থাকে এর সিংহভাগ এই দুধ তৈরিতে ব্যয় হয়ে থাকে। এখানে নারীর স্বীয় দেহের সৌন্দর্য বর্ধনের তুলনায় সন্তানের দৈহিক উন্নতির ব্যাপারটাই প্রাধান্য। দুধ পান করানোর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর শ্রষ্টা তাকে আবার পূনঃসন্তান ধারনের উপযোগী করতে থাকেন। আর নারীর দেহে এই ধারাবাহিকতা ততদিন পর্যন্ত বহাল থাকে যতদিন সে এই মহান দায়িত্ব (সন্তান ধারণের ক্ষমতাসম্পন্ন) পালনের উপযোগী থাকে। যেদিন থেকে বয়স বাড়ার দরুণ প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, সে দিন থেকে তার দৈহিক সৌন্দর্যতা, লাবণ্যতা আকর্ষণও বিলুপ্ত হতে থাকে। শীতের মৌসুমে শুষ্ক পাতা ঝরে ঝরে গাছের শাখা গুলি যেমনি করে শ্রীহীন হয়ে যায়। পড়ন্ত বিকেলে উড়ন্ত প্রজাপতির ডানার মৃদু বাতাসে যেমনি করে পাপড়ীগুলি ঝরে ঝরে পড়ে যায়। বার্ধক্যের চাপে নুইয়ে পড়া স্নিগদ্ধতা, কোমলতা হীন কংকালসার নারী দেহ যেন কোন কার্টুনিষ্টের ব্যাঙ্গ ছবি। শেষ জীবনের আরও নানান রোগ ব্যাধিতে, অসহনীয় দুঃখ যাতনায় তিলে তিলে ক্ষয় হতে থাকে তার দেহ, মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে তার এই কঠিন মুহূর্ত গুলি। এই আলোচনার দ্বারা বুঝাগেল,তাহলে নারী জীবনের সোনালী সময় তো সেটাই, যখন সে প্রজননের মত মহান গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকে। এরপর যখন সে নিজের জন্য বেঁচে থাকে তখন খুব কষ্টে দিন কাটায়। তাহলে বুঝাগেল তার সৃষ্টিটা হলো দাম্পত্য জীবনে এসে প্রজননের মাধ্যমে মানুষের বংশ বিস্তারের দায়িত্ব পালন করে যাওয়া এরই সাথে নারী সৃষ্টির আরেকটি মহান উদ্দেশ্য হলো, মানুষ পারিবারীক জীবন ধারণ করে সামাজিক জীবনের ভিত্তি গড়বে।

কেননা, দাম্পত্য সম্পর্কের দ্বারা সন্তানাদী ও একটি পারিবারিক পরিবেশের তৈরী হয়। এরপর এই পরিবার থেকে আরেক পরিবার, এমনিভাবে ৩য় পরিবার এমনিভাবে ঘর থেকে বাড়ী-পাড়া গ্রাম গড়ে উঠে। আর এই ভিত্তির উপরই সামাজিকতা-সভ্যতার সৌধ নির্মিত হয়। তাই প্রকৃতি নর-নারীর দাম্পত্য জীবনে পরস্পরের যে আকর্ষণ,অনুরাগ ও স্বাদ রেখেছে তা হলো মানবীয় চাহিদা পূরণ করার সাথে সাথে সেই মহান লক্ষ্যও পূরণ করে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু এই জৈবিক চাহিদাটাই পূরণ করে কিন্তু বংশ বিস্তারের মত মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নের ইচ্ছা করেণা। তার উপমা ঐ শ্রমিকের ন্যায় যে শুধু পারিশ্রমিক নিয়ে নিতে চায় কিন্তু শ্রম ব্যয় করতে চায় না। এমন স্বার্থপর শ্রমিক ধরাপড়লে অবশ্যই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। যেমনিভাবে এই শ্রমিক শ্রম ব্যয় না করেণ টাকা নিয়ে নেয়ার কারনে শাস্তি পায় ঠিক তেমনিভাবে ঐ লোক যে কেবল জৈবিক চাহিদা পূরণ করে ইনজয় করল (মজা নিল) আর আসল উদ্দেশ্য (প্রজনন) পূরণ করল না তাহলে সেও সৃষ্টি কর্তার কাছে অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে। বিধাতার শাস্তির হাত থেকে সেও রেহাই পাবেনা। কিছু শাস্তি সে দুনিয়াতেই নগদ নগদ পেয়ে যাবে। সেগুলি বিভিন্ন ক্ষতি হিসেবে তার সামনে প্রকাশ পাবে। তম্মধ্যে একটি হলো দৈহিক ক্ষতি।

Rb¥ wbqš¿‡Yi ^`wnK ¶wZ

জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করার দ্বারা নর-নারী উভয়েরণ মারত্নক শারীরিক এবং মানসিক ক্ষতি হয়। মহিলাদের শারীরিক ক্ষতির বিবরণতো আমরা পিছনে উল্লেখ করে এসেছি যে নারীদেহের গঠন প্রনালীতে প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে একথা প্রমাণ করে যে তার এই দেহ কেবল বংশবিস্তারের কাজের জন্য সজ্জিত। এ কারণেই যতক্ষন সে এ কাজের জন্য উপযোগী থাকবে ততক্ষন পর্যন্তই সে ভাল ও আকর্ষণীয় থাকবে। কিন্তু যখন সে এর অনুপযোগী হয়ে যায় তখন সাথে সাথে তার রূপ লাবণ্যতার উদ্যমতায় ভাটা পড়ে। পুরুষের অবস্থাও এর ব্যাতিক্রম নয়।

তার দেহ গঠনে স্বীয় স্বার্থের তুলনায় বংশ বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারীতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। নরদেহের পৌরুষ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এই পৌরুষ শুধু কেবল প্রজনন উপাদান প্রদান করেণ তার দায়িত্ব শেষ করে না বরং মানুষকে সে হরমোনও প্রদান করে। যার শক্তির উপর নির্ভর করেণ মানব সন্তানের দেহে চুল, পশম উৎপাদন হয়। দেহাবয়বে শক্তি ও সামর্থ্য যোগায়। মূল কাঠামোর হাঁড় গুলি শক্ত ও মজবুত হয়। দেহের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্তিশালী হয়। সেই সাথে মানুষের মানষিক পরিবর্তন সাধিত হয়। পুরুষের মধ্যে মেধা, বুদ্ধি, অনুভুতি প্রখর হয়ে উঠে। এই শক্তি, স্ববলতা, উদ্দিপনা, প্রফুল্লতা তখনই পুরুষের মধ্যে পাওয়া যায় যখন সে জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতি অবলম্বন করাছাড়াই প্রজননের লক্ষ্যে মিলন করে থাকে ও প্রজনন ক্ষমতাধর হয়। এরপর যখন সে এ মহান কাজ আঞ্জাম দেয়ার উপযোগী থাকেনা তখন আস্তে আস্তে তার তারুণ্যতা,উদ্যিপনা হ্রাস পেতে থাকে। তখন বার্ধক্য দেখা দেয় শরীর নিস্তেজ হয়ে আসে,প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া তার মূলত,মৃত্যুর আশনী সংকেত। এর দ্বারা বুঝা গেল যে নর-নারীর প্রাকৃতিক দাবি হলো সন্তান জন্ম দেওয়া। আর পৌরুষের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে সন্তানের দেহ ও মেধা বিকাশের উপর। সুধী পাঠক! এবার আপনি নিজেই বিচার করে দেখুন যখন মানুষ বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা শুধু সাময়িক পুলক অনুভব করাই তার মূল লক্ষ্য বানাবে,আর প্রজননের মত মহান লক্ষকে এড়িয়ে যাবে! অথচ তার প্রতিটি রগ ও রেশাতে তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন নিয়ে রক্ত সঞ্চালন করছে। তাহলে তার দেহেরে শৃংখলার উপর তার পৌরুষের কার্যকারিতার উপর যে কোন বিরুপ প্রভাব পড়বেনা সেকথা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

প্রফেসর লিওনার ঢেল এম.বি তার এক প্রতিবেদনে লিখেন: *g‡b ivL‡eb gvb‡li Rxe‡b †cŠi"‡li weivU ¸i"ZcY Ae`vb i‡q‡Q| †cŠi"‡li †h Dcv`vb †hŠb kw³ mwó K‡i †mUvB gvbe‡`‡n kw³, PvÂj¨Zv mwó K‡i| Avi GUvB gvb‡li e¨w³MZ ^bcb¨ c`kb Ki‡Z we‡kl fv‡e fwgKv iv‡L| Zvi Zvi"‡Y¨i KvQvKwQ eq‡m †cŠQvi mv‡_ mv‡_ hLb GB Dcv`vb ¸wji KvhKwiZv Avi I mwµq n‡q D‡V| ZLb*

†hgwbfv‡e Zvi‡`‡n cRbb ¶gZv mÂwiZ nq †mB mv‡_ Zvi ^`wnK m›`hZv, jveb¨Zv, cõUb, †gavkw³ kvixwiK ¶gZv, Zvi“b¨Zv, PvZiZv I mwó K‡i| Avi hw` GB †cši“I Dcv`vb mg‡ni †gšwjK D‡Ïk¨ ciY bv Kiv nq| Zvn‡j GB Dcv`vb ¸wj I Zv‡`i KvhKwiZv nwi‡q †dj‡e| we‡kl K‡i gwnjv‡`i‡K cRbb Kv‡R evav †`qvi Øviv gjZ: Zvi †`n bvgK GB mšvb mwói †gwkbUv‡K A‡K‡Rv K‡i †`qv I A‡nZK ewb‡q †djv| (ইসলাম আওর জবতে ওয়ালাদাত, নামক গ্রন্থ থেকে সংগ্রহিত সামনে যে ন্যাশনাল বার্থ রেট কমিশনের যে রিপোর্ট পেশ করা হবে সেটাও এই গ্রন্থ হতে নেয়া।) ১৯৩৭ সনে বৃটেনের "ন্যাশনাল বার্থ রেট কমিশন" জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল তাতে বলা হয়েছে; "জন্মনিয়ন্ত্রণের উপাদান সামগ্রী ব্যবহার করার দ্বারা পূরুষদের শারীরিক ক্ষতি দেখা দিতে পারে,সাময়িক ভাবে যৌনশক্তি হ্রাস ও পুরুষত্বহীনতা দেখা দিতে পারে। তবে সামগ্রীকভাবে বলা যায় যে এধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করার দ্বারা তেমন বড় ধরনের ক্ষতি হবেনা। তথাপি এর সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যে এই পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা পুরুষ অথবা নারী যখন সঙ্গমের পূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করতে পারছেনা,পারিবারিক ভাবে প্রাপ্ত অন্য সকল সুখ-আনন্দ,ইনজয়,তার কাছে গৌন,অন্য কোন কিছুতেই তার মন ভরবেনা। তখন সে এই আনন্দটা অনুভব করতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চেষ্ঠা করবে। যা তার দাম্পত্য সংসার ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হবে। এমনকি তার নানান শারীরিক জটিল সমস্যা,কঠিন যৌন রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে যেতে পারে।"

উক্ত কমিশন মহিলাদের ক্ষেত্রে এই উপদেশ প্রদান করে "জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করতে যদি কেউ বাধ্য হয় অথবা কারো সন্তানাদী জন্মের হার অনেক বেশি হয়ে যায়,তাহলে সে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু যদি এমন কোন আবশ্যকতা না থাকে তাহলে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে মহিলাদের শারীরিক অবকাঠমোতে নানান সমস্যা দেখা দেয়। এর দ্বারা এরা সাধারণত বদমেজাজি ও রুক্ষ স্বভাবের হয়ে উঠে। যখন তার মানষিক ভারসাম্য সে রক্ষা করতে সক্ষম না হয়

তখন সে তার স্বামীসহ অন্যদের সাথে ব্যবহার খারাপ করতে থাকে । এই অবস্থাটা বিশেষ করে ঐ মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি পরিলক্ষিত যারা ‘আযল’ করে (চরম উত্তেজনার মূহুর্তে প্রজনন উপাদান বের করে ফেলে দেয়) কোন কোন ডাক্তারদের মতানুসারে অতিরিক্ত জন্মবিরতি করণসামগ্রী ব্যবহারের দ্বারা জরায়ু বক্র হয়ে যায়,মেধার সল্পতা দেখা দেয় আবার কখনো কখনো পাগল,মানষিক প্রতিবন্ধি হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয় । এমনি ভাবে মহিলারা দীর্ঘদিন যাবৎ সন্তান না নেয়ার দরুণতাদের গুপ্তাঙ্গে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয় যার দরুণ সন্তান ধারণ করলেও তার প্রসবের সময় স্বাভাবিকের চেয়ে অত্যাধিক কষ্ট অনুভূত হয় । এছাড়া বার্থ কন্ট্রোলের কিছু কিছু পদ্ধতি এমনও রয়েছে,যেগুলি ব্যবহারের দ্বারা ক্যান্সার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে । বর্তমানে বিবাহের প্রতি গণসচেতনতা মূলক জাতীয় কাউন্সিলের মেডিকেল এ্যাডভাইজারি বোর্ডের সেক্রেটারী ডাঃ অসিতল দেবাকাশ এক বক্তব্যে বলেন: *AwP‡iB e‡U‡b Rb¥wbqš¿‡Yi e¨envi Kivi ewo (U¨ve‡jU) evRviRvZ Kiv n‡”Q| wKš' G¸wj Kivi Øviv K¨vÝv‡i Avµvš— n‡q hvIqvi AvksKv i‡q‡Q| K‡qK ermi Gme e¨envi Kivi Øviv Gi fqven cwiYwZ †`Lv hv‡e| GBme ewoi Øviv gwnjv‡`i Ab¨vb¨ kvixwiK mgm¨v A‡bK †e‡o †h‡Z cv‡i|* (দৈনিক আজামে মুজরিয়া ৩/৯/৬০ইং)

`v¤úZ¨ m¤ú‡Ki Dci Rb¥wbqš¿‡Yi wei"c cfve:

দ্বিতীয় মারাত্মক ক্ষতিটা হলো এই গর্ভধারণের ঝামেলা যখন থাকবেনা তখন যৈবিক চাহিদা সীমাতিরিক্ত বেড়ে যাবে,ডাক্তার ফোরস্টার লিখেন: মানুষের বৈবাহিক জীবনের মুল লক্ষ যখন জৈবিক চাহিদা মিটানো হবে,আর এই চাহিদা মেটানোর কোন বাধাধরা নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণ থাকবেনা,তখন অনিয়ন্ত্রিত ভাবে সন্তান নিলে যে পরিমান ক্ষতির সম্মুক্ষীন হতে হবে তার চেয়ে অনেক অনেক গুনে বেশি ক্ষতি দেখা দিবে সন্তান নেয়ার ঝামেলা মুক্ত হয়ে অবাধ যৌনাচারের দ্বারা (ইসলাম ও জন্মনিয়ন্ত্রণ ৫৬) এছাড়া আরেকটি বিষয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ আর তাহলো:- সন্তান

পিতামাতার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার এক দৃঢ় সেতু বন্ধনের ভূমিকা পালন করে থাকে। সন্তানের লালন-পালন,শিক্ষা-দীক্ষা ও তাকে তিলে তিলে গড়ে তোলার পিছনে উভয়ের যৌথ প্রচেষ্টা পরস্পরের প্রতি ভালবাসা আরও দৃঢ় ও মজবুত করে তোলে। কিন্তু যখন জন্মনিয়ন্ত্রণ করে সন্তান নেয়াই বন্ধ করে রাখল তখন তো উভয়ের ভালবাসার সম্পর্কটা অন্যান্য জীব জন্তুর ভালবাসার ন্যায় কেবল যৈবিক চাহিদা পূরণ করা ছাড়া আর কোন মহৎ লক্ষ্য থাকলনা। কেননা উভয়ের ভালবাসার মধ্যে কোন সেতু বন্ধন যেহেতু নেই তাই এদের ভালবাসাও দীর্ঘ ও দৃঢ় হবেনা। ছোট-খাটো বিষয় নিয়ে ঝগড়া,শেষ পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়াটা সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাড়াবে।

Rb¥wbqš¿‡Yi `i“Y PwiwÎK wechq:

১। জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহার করার দ্বারা মানুষের চারিত্রিক অবক্ষয় দেখা দেওয়ার সমুহ সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা এখনো অনেক সম্ভ্রান্ত খান্দান তাদের খান্দানী ঐতিহ্যের উপর গর্ভবোধ করে থাকে। আবার সেই খান্দানী ঐতিহ্যের দূর্ণাম হওয়াটাকে তাদের কাছে খুবই লজ্জা ও মানহানীকর মনে করা হয়। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর ব্যাপক প্রচলন ও সহজলভ্য হয়ে যাওয়ার দরুণ যিনা ব্যাভিচার,অশ্লিল,অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে কারও কোন বাধা থাকবেনা। যে কোন বংশ ও খান্দানের লোকজন এতে ব্যাপক পরিমানে জড়িত হয়ে যাবে। ক্রমান্নয়ে এই বিষবৃক্ষ ডাল-পালা মেলে বিষাক্ত অক্সিজেনে সভ্যতার সকল পরিবেশকে নীল করে তুলবে। যা আস্তে আস্তে মহামারির মত ছড়িয়ে পড়তে থাকবে,পরিবার থেকে সমাজ,সমাজ থেকে রাষ্ট্র,রাষ্ট্র থেকে গোটা বিশ্বব্যাপী। আর এভাবেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে মানুষের চরিত্র,পারিবারিক ঐতিহ্য। কারণ এর ব্যাপক প্রচলনের দরুণ এই অবাদ যৌনাচারের মত

ঘৃণ্য কাজ আর অবৈধ থাকবেনা। কেউ এটাকে খারাপ মনে করবেনা। তাই বাধা দিতেও কেউ এগিয়ে আসবেনা।[৫]

২। এই বাস্তবতা উপেক্ষা করার কোন উপায় নেই যে মানুষের সুনাম,সুখ্যাতি অর্জন করার পিছনে সন্তানের বিরাট ভূমিকা থাকে। সব পিতা-মাতাই স্বীয়

সন্তানকে লালন-পালন করে থাকেন। কিন্তু! সন্তানকে আদর্শরূপে গড়ে তোলা, শিশু কাল থেকেই তাকে ভারসাম্যতা,মিতব্যয়িতা,বিচক্ষণতা,ত্যাগী (ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকারী) সৎ পরিণামদর্শী,এরকম মহৎ গুনাবলী সমূহ লালন-পালন করার

সময় প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা পিতা-মাতার এক মহান গুরু দায়িত্ব। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণ এসকল কিছুরই প্রতিবন্ধক।

৩। এছাড়া বাচ্চাদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে শুধু যে পিতা-মাতারণ ভূমিকা থাকে তা কিন্তু নয়। বরং বাচ্চারাও পরস্পরে এক বাচ্চা অন্য বাচ্চার লালন-পালনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। তাদের সকলের পরস্পরের সহাবস্থান ও মেলামেশায় প্রীতি,ভ্রাতৃত্ব,বন্ধুত্বের এক আবেগময় পরিবেশ সৃষ্টি করে

১। এই জন্ম নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আমেরিকায় প্রতি বছর প্রায় (১০,০০০০০) দশলক্ষাধিক অবৈধ গর্ভের সন্তান নষ্ট করা হয় এবং শতকরা পঞ্চাশ জন যুবক যুবতী ও শতকরা ২৬ জন কিশোরী যিনায় লিপ্ত হয়। এবং ৪৭% পুরুষ ও মহিলা অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়। যার ফলে ১৯৫৭ সালের এক জরিপে আমেরিকায় দুই লক্ষ্যরও বেশী অবৈধ সন্তান হয়েছে। ১৯৬০ সালে সেখানে প্রায় দুই লক্ষ্য ছাব্বিশ হাজার জারজ সন্তানের সন্ধান পাওয়া গেছে। বর্তমানে এর সংখ্যা কোন পর্যায়ে তা আল্লাহই ভাল জানেন।

২। বৃটেনে অসংখ্য অবৈধ সন্তান জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ধ্বংস করা সত্ত্বেও ৮০% এর বেশি জারজ সন্তান জন্ম গ্রহণ করে থাকে। প্রতি ৮ জনে একজন জারজ সন্তান পাওয়া যায়। সেখানে অসংখ্য কুমারী নারী ও কিশোরী বিবাহ উত্তর সতিত্ব হারায়।

৩। ফ্রান্সের অবস্থা আরো করুণ। সেখানে ৯০% নারী বিবাহের পূর্বেই অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হয়ে থাকে। অবৈধ যৌনাচারের বিশাল বাজার। এবং এ নিয়ে তারা গর্বও করে থাকে। আর এসব অবৈধ যৌন কর্মকান্ড ঘটে থাকে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের দ্বারা। এসব পশ্চাত্য দেশ সমূহের মত মুসলিম প্রধান এই বাংলাদেশেও এর বিষফল ছড়িয়ে পড়ছে দিন দিন আশংকা জনক হারে।

থাকে। যে বাচ্চা মেলামেশা,খেলাধুলা এবং অন্যান্য কাজে সহযোগী হিসেবে অন্য কোন বাচ্চাকে না পায়,সে অনেক ভাল ও মহৎ গুনাবলী অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। (আর জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সন্তান সীমিত রাখলে উপরোল্লিখিত সমস্যা বাচ্চাদের দেখা দেয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।)

RvZxq I mvgMxK fv‡e Gi ¶wZKviK cfve:

জন্মনিয়ন্ত্রণের দরুণ সমগ্র জাতি কি কি অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুক্ষিণ হতে হয় এখন সে দিকে একটু দৃষ্টি দেয়া যাক:

১। নর-নারী প্রত্যেকবার সঙ্গম কালে নরদেহ থেকে প্রজনন উপাদান (শুক্রানু) নারীর প্রজনন উপাদানের (ডিম্বানো) সাথে মিলিত হবার জন্য জরায়ু থেকে বের হয়ে সামনে অগ্রসর হয়। এই উভয় প্রকার প্রজনন উপাদান (ডিম্বানো-শুক্রানো) একত্র হওয়ার দ্বারা প্রত্যেকটাই মানব সন্তান জন্ম দিতে ও বংশ বিস্তারে ভূমিকা রাখতে পারে। এমনি ভাবে ব্যক্তিগত অভ্যাস, মেজাজেরও ধারক বাহক হয়ে থাকে। এই যৌথ প্রজনন উপাদানের সংমিশ্রণের ফলেই মানব সন্তানের চারিত্রিক অবস্থায় কেউ জ্ঞানী,মেধাবী,সাহসী হয় আবার এর মধ্যে হতে কেউ বোকা,নির্বোধ,ভীরুও হয়ে থাকে। তবে এটা মানুষের সাধ্যের বাইরে যে, কোন প্রজনন উপাদানের সাথে কোন প্রজনন উপাদানকে মিলাবে? আর কোন ধরনের সন্তান সে নিবে! তাই এই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না যে যখন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সে অবলম্বন করল,ঠিক সেই সময় এমন একটি সুসন্তানের আগমনকে সে
রোধ করতে সচেষ্ট হল যে হতে পারত দেশ জাতির কর্ণধার। শ্রেষ্ট মেধাবী,বুদ্ধিজিবী,জেনারেল,বিচারপতি,রাষ্ট্রপতি ইত্যাদি। জাতির এই মহান সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেয়া হলো। আর এর পরিণামে এমন সন্ত ান তার ভাগ্যে জুটল যে নির্বোধ,গাদ্দার,ভীরু ও স্বার্থপর ধরনের। আর যখন এধরনের স্রষ্টার কাজের উপর হস্তক্ষেপের মত ধৃষ্টতা ব্যাপক হতে থাকবে এর পরিণতিতে জাতি মেধাবী সন্তানদেরকে হারাবে কম মেধাবীরা জাতির কর্ণধার হবে,এজাতি আর উন্নত হতে পারবে না। আর এদের দ্বারা

জাতির উন্নতি সম্ভব হবেনা। মেধাবীদের সেবা থেকে জাতি বঞ্চিত হবে। তখন মেধাবীদের শুণ্যতা হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

২। জন্মনিয়ন্ত্রণের দ্বারা যেই জাতির জনসংখ্যা কমে যাবে,তারাতো সর্বদা ধ্বংশের দ্বারপ্রান্তে অবস্থান করতে থাকবে। কখনো যুদ্ধ বেঁধে গেলে অথবা মহামারী দেখা দিলে অথবা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে (যেমন ভুমিকম্প,বন্যা,জলোচ্ছাস ও সুনামী ইত্যাদি) তখন লোক সংখ্যার এত প্রকট সংকট দেখা দিবে (!) যে এই সংকট কাটিয়ে উঠা তাদের জন্য মহা মুশকিল হবে। এছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপক প্রচলনের দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে এক স্বেচ্ছাচারি মনোভাব দেখা দিবে। প্রত্যেকেই তার নিজের স্বার্থটাকে প্রাধান্য দিয়ে চিন্তা করবে তার কয়টা সন্তানের প্রয়োজন? এর বেশি সন্তান না নিয়ে সে এই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে নিবে স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে। সে এই কথা চিন্তা করবে না যে দেশ ও জাতির প্রয়োজনটা কি? এরপর যখন গোটা দেশজুড়ে প্রয়োজনীয় লোকের ব্যাপক সংকট দেখা দিবে তখন তা পূরণ করার আর কোন ব্যবস্থা/ উপায় থাকবে না।

৩। অর্থনৈতিক দৃষ্টি কোন থেকে : জন্মনিয়ন্ত্রণের মূল কারণ হিসেবে ধরা হয় দারিদ্রতা ও অর্থনৈতিক সংকটকে। তাই এখানে আমরা এবিষয়টি নিয়ে নিখুঁতভাবে আলোচনা করতে চাই যে আসলেই কি অথনৈতিক সংকটের দরুণ জন্মনিয়ন্ত্রণ করা (আবশ্যক) জরুরী ? নাকি জরুরী নয়; আর অর্থনৈতিক বিবেচনায় তা কতটুকু উপকারী? এর মূল রহস্য জানতে হলে আমাদেরকে আরও দেড়শত বছর পিছনে দৃষ্টি দিতে হবে। কেননা দারিদ্রতার ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করার চিন্তা ধারা ১৭৯৮ সনে ম্যালথাস (ইংল্যান্ড) সর্ব প্রথম আবিস্কার করেছিল।

RbmsL¨v ew× I g¨vj_v‡mi wPšÍvaviv:

একথাতো বহুকাল থেকেই প্রচার হয়ে আসছে যে যেহারে জনসংখ্যা বাড়ছে সে হারে (ল্যান্ড) ভূমি বাড়ছেনা,জীবিকা বাড়ছেনা। তাই অদুর ভবিষ্যতে আবাদ ভূমি ও জীবন উপকরণের প্রচণ্ড সংকট দেখা দেওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই প্রচারটা শুধু এই “আধুনিক যুগের” নয়

বরং মধ্য যুগের লোকেরাও এই আশংকার দরুণ তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলত। কিন্তু এই আধুনিক যুগে যে সর্ব প্রথম এই বিষয়টার প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন তিনি হলেন ইংল্যন্ডের প্রশিদ্ধ অর্থনীতিবিদ ম্যালথাস। ঊনবিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে তিনি এই আহবান জানালেন যে স্বল্প আয় ও দারিদ্রতা জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্তরায়ের কারণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ জীবনোপকরণ সামগ্রীর উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। আর এমনিভাবে মানুষের মাথাপিছু গড় আয় থাকে অনেক নিচে। এর প্রবৃদ্ধি বাড়ানো সম্ভব হয়ে উঠে না। যতক্ষন পর্যন্ত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করা যায়। সহজ ভাষায় বলতে গেলে ভূমি ও জীবনোপকরণ সামগ্রীর তুলনায় জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়ছে। আর উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যতা তখনই বজায় রাখা সম্ভব যখন ক্রমান্বয়ে জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যাবে।

আর এই নিয়ন্ত্রণ বজায়ে রাখার জন্য ম্যালথাস দুইটা ফর্মুলার কথা তুলে ধরেছেন ১) প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ: অর্থাৎ ঐ নিয়ন্ত্রণ যা বর্তমান জনসংখ্যাকে কমিয়ে দেয়। যেমন:- দুর্ভীক্ষ,মহামারী,যুদ্ধ ইত্যাদী। ২) পরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণ:- অর্থাৎ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা যার দ্বারা মানব সন্তানের আগমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। যাতে সে পৃথিবীতে আসতে না পারে। প্রথম প্রকারের নিয়ন্ত্রণ তো মৃত্যুর সংখ্যা অধিক হওয়ার দ্বারা,আর ২য় প্রকার নিয়ন্ত্রণ হলো জন্ম হার নিয়ন্ত্রণ রাখার দ্বারা। এরপর যারা জনসংখ্যাকে সীমিত রাখতে চেয়েছে তারা ২য় পদ্ধতি তথা জন্ম হার নিয়ন্ত্রণ রাখার মাধ্যমে জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে।

এখন জন্মনিয়ন্ত্রণের অর্থনৈতিক দিকটা জানতে হলে আমাদের প্রথমে দুটি দিক জানতে হবে। ১. ম্যালথাসের এই চিন্তাধারা কতটুকু যথার্থ ছিল?
২. এর পরবর্তী লোকেরা যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করল সেটা সঠিক ছিল,নাকি ভুল ছিল? তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে ম্যালথাসের পরবর্তী লোকেরা জন্মনিয়ন্ত্রণের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে সেটা সম্পূর্ণ ভুল ছিল। ম্যালথাসের চিন্তায় জন্মনিয়ন্ত্রণের যে পরিকল্পনা ছিল সেটা আজকের প্রচলিত পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। সেটা ছিল দেহকে

নিয়ন্ত্রণ করার প্রাচীন পদ্ধতি। হারওয়ার্ক ইউনিভার্সিটির সাবেক প্রফেসর অর্থনীতিবিদ এফ.ঔ টাসিগ লিখেছেন যে, *g¨vj_v‡mi cwiKíbv weev‡ni eqm wcwQ‡q †`Iqv| A‡bK eq¯‹ n‡q †`wi‡Z we‡q Kiv| hv‡Z mšÍvb Kg nq| Avi AwaK eqm nIqvi `i"Y GgbI n‡Z cv‡i †h A‡bK †jvK we‡qi Av‡MB gviv hv‡e|* (তরজমা উছুলে মা'সিয়াত ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৩৪) তার এই প্রস্তাব এই কারণে ছিলনা যে এযুগের আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি তখন ছিলনা তাই সে এমন অদ্ভুত প্রস্তাব করেছিল। কেননা, যদি ধরে নেয়া হয় যে এই আধুনিক পদ্ধতি তখন ছিলনা কিন্তু 'আযল' তো এর বহুকাল পূর্বে থেকেও প্রচলিত ছিল। এতদ্ব সত্যেও ম্যালথাস আধুনিক কোন পদ্ধতি অবলম্বনের পরামর্শ দেননি। কিন্তু অনুসারীরা ভাল-মন্দ বিচার বিশ্লেসন না করেই এমন এক ভয়াবহ ক্ষতিকারক পদ্ধতি অবলম্বন করল যা বর্ণনাতীত।

২. ম্যালথাসের পরিকল্পনাটাও এত মারাত্মক নয় যতটা মারত্মক আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচলিত পদ্ধতিতে রয়েছে। কিন্তু ম্যালথাসের পরিকল্পনা ও চিন্তা ধারাটাও মৌলিক ভাবে সঠিক নয়। কেননা ম্যালথাস যে প্রেক্ষাপটে এই মতবাদ কায়েম করেছিল তাতে জনসংখ্যার ব্যাপক প্রবৃদ্ধি নিঃশন্দেহে দুঃচিন্তার কারণ ছিল। যখন নতুন শতাব্দীর উন্নত জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণার ফলে কল্পনাতীত তথ্য প্রযুক্তির আবিষ্কারের দ্বারা একটি উন্নত জাতি কোন একটি নতুন দেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। তখন এদেশটিকে গড়ে তুলতে হলে সব শ্রেণীর সব পেশার লোকের দরকার হয়। আর তাই জনসংখ্যার ব্যাপক চাহিদা থাকার দরুণজন্মনিয়ন্ত্রণ না করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টার ব্যাপক সুযোগ থাকে । ম্যালথাস যে যুগে তার মতবাদের কথা দুনিয়াবাসিকে জানিয়ে ছিল তখন উত্তর আমেরিকা সহ বেশ কয়টি রাষ্ট্র নতুন আবিষ্কার হওয়ায় সেসব দেশে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন ছিল বেশি। তার মানে এই নয় যে সব দেশে সব প্রেক্ষাপটেই লাগামহীন ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলা হবে। ডা.এফ.ডব্লিউ টাসিগ এর মতেঃ *ev¯eZv n‡jv cvYxK‡ji †Kvb cvYxi eskB Zvi wbw`ó mxgv AwZµg Ki‡Z cv‡iYv| hw` GgbUv nq Zvn‡j wKQ w`‡bi g‡a¨B †`Lv hv‡e †h*

†MvUv cw_ex R‡o †Kej H cvYxi eskB we¯Z n‡q hv‡e| Ab¨‡`i †e‡P _vKvB KwVb n‡q co‡e| gvbl I Gi †_‡K Avjv`v bq| c‡Z¨K kZvãxi GK PZ_vsk †k‡l cwimsL¨vb wb‡j †`Lv hvq †h kZvãxi ïi“‡Z hv wQj Gi Øx¸‡bi †ewk nq bv| Z‡e A¯vfweK †Kvb wKQ NU‡j ZLb mg‡qi Pwn`vi Dci wfwËK‡i RbmsL¨v Avkvbi|c ew× ‡c‡q _v‡K| †hgb bZb †Kvb †`‡ki Awe®vi n‡j †m †`‡ki Pwn`vi Kvi‡Y RbmsL¨v A¯vfweK fv‡e ew× ‡c‡q _v‡K| †hgbUv cwi jw¶Z n‡q‡Q Dfq Av‡gwiKvi †¶‡Î| GgbwK Av‡gwiKvi msh³ †`k ¸wj‡ZI c_g w`‡K RbmsL¨vi ew×i nvi A¯vfweK wQj| Ggwb fv‡e KvbvWv,A‡ówjqv,Av‡Rw›Ubv BZ¨v`x iv‡ói †¶‡Î I| Ggb A¯vfweK nv‡i RbmsL¨vi ew× †MvUv BwZnv‡m nv‡Z †Mvbv gvÎ GB KÕwU †`kB| GQvov †MvUv cw_exR‡o RbmsL¨v Zvi wbw`ó MwZ‡Z evo‡Q| gvbl ev Ab¨ †h †Kvb cvYx Zvi Pwn`v †gvZv‡eKB †e‡o _v‡K| Gi †ewk †KD B”Qv Ki‡j I evov‡Z cvi‡e bv| (তরজুমা উছুলে মা'শিয়াত, ডা.টা. সিগ, ৩২০.) এছাড়া ম্যালথাসের যুগে যা কল্পনাতীত ছিল,সেই সকল দ্রুতগামী যানবাহন, বিশালাকৃতির জাহাজ,ট্রেন,বিমান,বাস,ট্রাক ইত্যাদী তখন আবিষ্কার হয়নি। কিন্তু এযুগে বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষ সফলতা যানবাহনের আবিষ্কারের ফলে দূরদূরান্তে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে মানুষ ও তার প্রয়োজনীয় সামগ্রীকে অতি সহজ ও দ্রুত পৌঁছে দিচ্ছে। প্রাচীন দেশ সমূহ হতে প্রচুর জনগোষ্টি নতুন আবিষ্কৃত রাষ্ট্রে গিয়ে বসবাস করছে। এবং তারা সেখানে অনেক পন্য উৎপাদন করে আবার প্রাচীন দেশ সমূহে রপ্তানী করছে। নতুন ও প্রাচীন দেশ সমূহের পারষ্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত ও সহজতর হওয়ায় (বসত ভিটা)মানুষের বসবাস উপযোগী ভুমি দারুণভাবে বিস্তার লাভ করেছে। এব্যাপারে ডব্লিউ, এইচ, মোরলেন্ড এর বক্তব্য †m h‡M g¨vj_vm RbemwZi Dci wPwšZ n‡q Rb¥wbqš‡Yi gZev` Kv‡qg K‡iwQj| AvR‡Ki `wbqv ZLbKvi Zjbvq m¤úY wfb| †m RvbZbv †h GKUv hM Ggb Avm‡e hLb †ij,BwÄb PwjZ Rvnv‡R K‡i gvbl I Zvi Lv`¨`e¨ Ges wbZ¨ c‡qvRbxq mvgMx‡K cw_exi GK cvš n‡Z

Ab¨ cv‡š wb‡q hvIqv n‡e| g¨vj_v‡mi gZev‡`i gj wfwË H wPš vavivi Dci wQj †h,†m g‡b KiZ c‡Z¨K iv‡ói gvbl‡K Zvi Lv`¨ e¯ evm¯vb mn mKj c‡qvRbxq Avmeve H iv‡ói wfZ‡iB ciY Ki‡Z n‡e| Avi g¨vj_v‡mi h‡M cw_exi ‡c¶vcUUvI GgbB wQj| wKš GLb‡Zv wPÎ m¤úY cv‡ë †M‡Q| AvR‡Ki GB cMwZkxj `wbqvi †Kvb ivó hw` B"Qv K‡i Zvi mKj KwIRvZ cb¨ Ab¨‡`k †\_‡K Avg`vbx K‡i Zvi †`‡ki Pwn`v wgUv‡e Zvn‡j Zv Le mn‡RB ciY Ki‡Z cvi‡e| Z‡e †m iv‡ó‡K Ab¨ †Kvb cY¨ Drcv`b K‡i,wewµ K‡i KwIRvZ cb¨ µq Kivi gZ gjab ARb Kivi †hvM¨Zv ARb Ki‡Z n‡e| †hgb Bsj¨vÛ Zvi Lv`¨ `e¨,KwIRvZ cY¨ Le KgB Drcv`b K‡i _v‡K| †m Zvi Ab¨vb¨ KwiMwi hšvsk Drcv`b K‡i †mUvi wewbg‡q Ab¨ ivó †\_‡K KwIRvZ cY¨ Avg`vbx K‡i _v‡K| (মুকদ্দমা-মা শিয়াতী)

মিঃ মোরল্যান্ড সাহেবের কথার উপর কেউ কেউ এই অভিযোগ করেন যে "নতুন নতুন দেশ আবিস্কারের ফলে জনবসতির ভারসাম্যতা বজায় রাখা সেটা বিগত শতাব্দীতে সম্ভব ছিল। কিন্তু বর্তমানে বা ভবিষ্যতে এমন নতুন দেশের আবিষ্কার নিতান্তই বিলাসী কল্পনা মাত্র। নতুন দেশের আবিস্কার তো দুরের কথা সব দেশে দ্বীপ আবিষ্কারের খবরও খুব বেশি একটা শুনা যায় না। যদি এমনটা হয় ও সেটা মহাসাগরের উপকেন্দ্রীয় দেশ সমূহে হলেও হতে পারে। তাও সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। এমনিভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবিস্কার ও তার শেষ প্রান্তে এসে উপনিত হয়েছে। সুতরাং এখানেও বেশি কিছু আশা করা যায়না। তাছাড়া এসব উৎপাদন মুখি ইঞ্জিন ও তার ধূঁয়ার দরুণপরিবেশ মারাত্নক ভাবে দুষিত হচ্ছে। জনজীবন বিষিয়ে তুলছে। তাই এটারও লাগাম টেনে ধরতে হবে বাচার তাগিদেই। সারকথা হলো এখন আর আগের মত ভুমি বাড়ার সম্ভাবনা নেই প্রযুক্তি আবিস্কারেরও তেমন আর সম্ভাবনা নেই যার দ্বারা মানুষের চাহিদা পূরণের অলৌকিক কোন ব্যবস্থা নিতে পারবে। সুতরাং এত সব সমস্যা থাকা সত্যেও যদি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহলে অদুর ভবিষ্যতে না হোক সুদুর ভবিষ্যতে হলেও জনসংখ্যা

এক মারাত্মক বিপদ হয়ে দাড়াবে। এই অভিযোগের জবাব তিনভাবে দেয়া যায়। ১) নতুন দেশ আবিস্কার ও নতুন প্রযুক্তির আবিস্কার এটা এখন যেমন আমাদের কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে ঠিক তেমনি ভাবে অসম্ভব মনে হয়েছিল ম্যালথাসের যুগেও। সে যুগের কেও কি কল্পনাও করতে পেরেছিল যে ভবিষ্যতে এমনদিন আসবে যেদিন মানুষ সমুদ্রের বুক চিড়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে আরেক প্রান্তে ঘুরে বেড়াবে। পাখির মত মানুষ ও আকাশে বাতাসে বিমানে করে উড়ে বেড়াবে? হাজার হাজার মাইলের দুরত্ব মাত্র কয়েক ঘন্টায় দ্রুত অতিক্রম করতে পারবে? মানুষ পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করে সুদুর চাঁদের দেশে,মঙ্গল গ্রহে পৌঁছে যাবে? এমনিভাবে রকেট এবং তার চেয়ে দ্রুত গতির যানে করে মহাকাশ চষে বেড়াবে? এসব বিলাসী কল্পনাতো জ্যোতিষী ও জাদুকররা করতে পারত কেবল। কিন্তু আজকের পৃথিবী তা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করছে। এমনিভাবে আরও যত নব আবিস্কৃত যন্ত্রাদী তখনকার মানুষের কল্পনার বাইরে ছিল। আজকের মানুষ তা অনায়াসে ব্যবহার করছে। ঠিক তেমনিভাবে আজকের মানুষের মধ্যে যা কল্পনাতীত বিষয় সেগুলিও পরবর্তী মানুষেরা প্রয়োজনে আবিষ্কার করতে পারবে না তা বলার কোন যৌক্তিকতা নেই। ২) যদি একথা ধরে নেয়া হয় যে বেড়ে ওঠা জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করার মত অথবা তাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করার মত কোন মাধ্যম আবিস্কার হবেনা (!) তাহলে এটাও মুর্খলোকের ন্যায় স্পষ্ট যে অদূর ভবিষ্যতে জনসংখ্যাও বাঁধভাংগা জোয়ারের ন্যায় সীমাহীনভাবে বেড়ে যাওয়ার তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। আর সুদূর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ঘুম নষ্ট করার দ্বারা ক্ষতির চেয়ে লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। ৩) প্রফেসর ইলয়াছ বারণী 'উসুলে মা' শিয়াত' নামক গ্রন্থে এব্যাপারে লিখেছেন যে, *Ae¯v `‡ó g‡b n‡"Q †h nqZ RbmsL¨v GZ cPi cwigv‡b †e‡o hv‡ebv †h G‡`i c‡qvRbxq mgMx cv I qv hv‡ebv]*| জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের যে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে তা কিছুটা এধরনের:- একথা বলার পর তিনি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কিছু বাস্তব চিত্র বা পরিসংখ্যান তুলে ধরেণ। যা সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরা হলোঃ- ক) অভিজাত শ্রেণীর পরিবার গুলোতে বেশির ভাগ বিলাসিতা বা আরামের দরুণ তারা সন্তান কম নেয়। সেই

তুলনায় মধ্যভিত্ত ও নিম্নভিত্ত পরিবার গুলিতে অধিক পরিমানে সন্তান হতে দেখা যায়। এদের অবস্থা দৃষ্টে যা অনুভব হয় তা হলো অর্থ ও প্রাচুর্যের আধিক্যতার দরুণঅর্থাৎ আরও অর্থ কিভাবে অর্জন করা যায় এই চিন্তায় সন্তান নেয়ার মত পর্যাপ্ত সময় তারা পাননা তাই তাদের সন্তানাদী তুলনা মূলক কম দেখা যায়। খ) আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণীতে মেধা বিকাশের প্রতিযোগিতায় ব্রেনের উপর অতিরিক্ত প্রেশার পড়ার দরুণ শারীরিক শক্তি বা যৈবিক চাহিদা অনেকখানি কমে যায়। এজাতীয় লোকগুলির কেউ কেউ বিবাহের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাই শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি এশ্রেণীর লোকদের মাধ্যমে জন্মহারও নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে।

গ) পাশ্চাত্যের উন্নত দেশ সমুহে নারীদের মধ্যে এমন কিছু তথাকথিত স্বাধীনচেতা নারীর সংখ্যাও আশংকা জনকভাবে বাড়ছে যারা সন্তান জন্ম দেয়া ও তাদের লালন-পালন এর ঝামেলা মুক্ত হয়ে চাকরী বাকরী,সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্ম-কাণ্ডে লিপ্ত থাকতে বেশি ভালবাসে। এদেরকে এ ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়া হয় ও উদ্বুদ্ধ করা হয়। তাই এদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে দ্রুত যারা বিবাহ শাদীর প্রতি অমনোযুগী ও অনেচ্ছুক। ঘ) ইসলামী বিধান তথা পর্দা না মানার কারনে এদের নৈতিক চরিত্র দিন দিন অবক্ষয় হচ্ছে। অশ্লিলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সংক্রান্ত কঠিন রোগ ব্যাধি ও আশংকাজনক হারে ছড়িয়ে পড়ছে। যার দরুণ যৌনশক্তিও বিলুপ্তি অথবা হ্রাস পাচ্ছে। সেই সাথে এজাতীয় লোকদের থেকে সন্তানাদী কম হচ্ছে। ঙ) প্রত্যেক শতাব্দীতে কমপক্ষে দু-চারটা যুদ্ধ তো অবশ্যই সংঘটিত হচ্ছে বিশেষ করে এই বিজ্ঞানের উৎকর্ষের যুগে পারমানবিক ও আনবিক বোমসহ আরোও অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র আবিষ্কারের ফলে যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। চ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ মহামারী,ভূমিকম্প,ঘূর্ণিঝড়,তুফান,যানবাহনের দুর্ঘটনা ক্রমান্বয়ে বাড়ছেই। সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তার সৃষ্টিকে কেটেছেটে রাখার তথা নিয়ন্ত্রণে রাখার যেন এক কুদরতী খেলা। তাহলে বুঝাগেল জনসংখ্যা সীমাহীনভাবে বেড়ে যাওয়া এবং তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী দুস্প্রাপ্য হওয়ার আশংকা করা বাস্তব সম্মত নয়।আল্লাহ তায়ালা যা সৃষ্টি করেণ সেটাই সকল প্রাণীকূলের

প্রয়োজন পূরনে যথেষ্ট হবে। (উসুলে মা'শিয়াত, পৃঃ ৬১৯ ইলিয়াছ বারণী প্রণীত)

এছাড়াও জনাব প্রমুদ নাথ ব্যানার্জী তার লেখা "ইন্ডিয়ান ইকোনোমিক্স)" গ্রন্থে প্রমানসহ উল্লেখ করেছেন যে, *RbmsL¨v e„w× †Kvb f‡qi KviY bq| wZwb c_‡gB GKwU †hŠw³K `jxj Dc¯'vcbv K‡i‡Qb Avi Zv n‡jv: ÒRb¥nvi †ewk n‡q hv‡"Q e‡j g‡b Kivi GUvI GKUv KviY n‡Z cv‡i †h Av`g ïgwi c‡ei Zjbvq GLb A‡bK ¸i"Z mnKv‡i I cwicYfv‡e Kiv n‡q _v‡K|Ó* অর্থাৎ আগে মানুষ জনসংখ্যার (পূর্ণ বিবরণটা) সঠিক হিসাবটা জানত না বিধায় এটা নিয়ে এতটা ভাবত না। কিন্তু এখন খুব গুরুত্ব সহকারে এটা করা হয় এবং এর সঠিক সংখ্যাটা জানার কারণে জনসংখ্যা নিয়ে মানুষ বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, *mviv cw_exi Zjbvq wbD Bsj¨v‡Ûi gvmv PwÞm iv‡R¨ Rb¥wbqš‡Yi cPvi cmvi Le †Rv‡o‡mv‡o ïi" Kiv nq| hv Ab¨ ‡Kv_vI GZ e¨vcK fv‡e Kiv nqbv| ZvB †mLvbKvi Rb¥nvi mviv cw_exi †h †Kvb GjvKvi Zjbvq mewbg| †mLvbKvi ¯vaviYZ Rb¥nvi n‡jv cwZ nvRv‡i 24-25 kZvsk|* (উসুলে মা'শিয়াত পৃঃ ৩২৮) এরপর মিঃ প্রমদ নাথ লিখেন: "প্রফেসর সিং সিন এর মতে, *RbmsL¨vi weIqwU †Kej Av`g ïgvixi DciY †kI bq| eis Gi mv‡\_ Drcv`b kw³ Ges Awbevh e›U‡bi bxwZi mv‡_I m¤úK i‡q‡Q| Drcv`b nv‡mi weavb †Kej cwicYi|‡c Kwl‡¶‡ÎB c‡hvR¨ n‡Z cv‡i| cKZ Zjbv RbmsL¨v I Lv‡`¨i mv‡_ bq| eis RbmsL¨v I m¤ú`- Gi g‡a¨| hw` RbmsL¨v ev‡o Avi m¤ú` Av‡Mi gZB \_v‡K, A\_ev RbmsL¨vi Zjbvq m¤ú` K‡g-ev‡o †hUvB †nvK Zvn‡j gvb‡li `‡fvM Av‡ivI †e‡o hv‡e| AZGe AZx‡Z fvi‡Zi A\_%bwZK Ae¯v †miKgB wQj| Gi wecixZ hw` RbmsL¨v ew×i mv‡_ mv‡_ Drcv`b m¤ú` I mgvb Zv‡j evo‡Z _v‡K †mB †`‡k eZgvb RbmsL¨vi †P‡q Av‡ivI AwaK †jvK Abvqv‡m m"Qj fv‡eB emevm Ki‡Z cvi‡e|* উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা আপনাদের হয়ত বিষয়টি স্পষ্ট বুঝে এসে থাকবে যে ম্যালথাস যে যুগে জনসংখ্যার বিষয়টি

ভেবে ছিল তখন পরিস্থিতি এক রকম ছিল এখন আরেক রকম। তাই তখনকার পরিস্থিতি নিয়ে ভেবে এযুগে মাথা নষ্ট করার কোন মানে হয় না। তবে ম্যালথাসের পরে জনসংখ্যার বিষয়টি যে ব্যক্তি সংস্কার করে উপস্থাপন করেছে তার নাম হলো 'মার্শাল' তার চিন্তাধারাটি অবশ্য বিবেচনার বিষয়। তার মতে উনবিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে বৃটেনের অর্থনীতিবিদরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারনে জীবিকার উপর এর প্রভাব পড়ে বলে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাতে কিছু অতিরঞ্জিত করেছেন। কিন্তু তাদের এই মতামত একটা নির্দিষ্ট পরিসর পর্যন্ত যথার্থ ছিল। তাদের পক্ষে কি এটা জানা সম্ভবপর ছিল? ভবিষ্যতে আমদানী রপ্তানীর মাধ্যম (যানবাহন) এর এত অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হবে যে পৃথিবীর উর্বর জমিনের উৎপাদিত ফসল দুরদুরান্তের দেশে গিয়ে এত সস্তা মূল্যে বিক্রি হবে? একথা অবহিত হওয়া তাদের পক্ষে কিভাবে সম্ভব ছিল? বিজ্ঞানের উন্নতিতে মানুষ তাদের সীমিত যানবাহনের মাধ্যমেই এত প্রচুর প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে? কিন্তু! এসকল কিছুই আজকের যুগে আমাদের সামনে বাস্তবে দৃশ্যমান তাই ম্যালথাসের চিন্তা ধারা কত পুরানো হয়ে গিয়েছে। আর বর্তমানের আধুনিক প্রেক্ষাপট সেটার সাথে কোন সামঞ্জস্যশীল রইল না। তবে যদিও এই মতবাদের ধরণটা পূরাতন হয়ে গিয়েছে কিন্তু ! মৌলিকভাবে সেটা যথাস্থানে এখনো এক পর্যায়ে সঠিক বলেই মনে হয়। এরপর মার্শাল জনসংখ্যার বিষয়টিকে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণ দুইভাবে হয়। ১) একটি হলো কুদরতিভাবে বৃদ্ধি। অর্থাৎ মৃত্যুর তুলনায় জন্ম হার বৃদ্ধি হওয়া। ২। দ্বিতীয়টি হলো নাগরিকত্ব প্রদানের মাধ্যমে অর্থাৎ ভিন দেশের নাগরিকদেরকে তার দেশে অনুমোদনের মাধ্যমে নাগরিত্ব প্রদান করা।

K`iZfv‡e ew× t

তম্মধ্যহতে প্রথম বিষয় অর্থাৎ অধিক জন্মহারকে নিয়ন্ত্রণ করা সেটা অধিকাংশ মানুষের ঐ সকল অভ্যাস এর উপর হয়ে থাকে যা বৈবাহিক

সম্পর্কের দ্বারা দেশের নাগরিকদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু! সেই সকল অভ্যাস এর উপর নিম্নের বর্ণিত সমগ্রীর প্রভাব পড়তে পারে।
ক) আবহাওয়ার প্রভাব। গরম প্রধান দেশের লোকেরা তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলে,আর শীত প্রধান দেশের লোকেরা দেরিতে বিয়ে করে। খ) সন্তান লালন পালনের কষ্ট। আমরা দেখি যে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিবাহ শাদীর বয়স বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যথা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে দেরিতে বিবাহ শাদী করার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। আবার হস্ত শিল্পী,কারিগর পেশাজীবি লোকেরা এদের তুলনায় একটু আগেই বিয়ে শাদী করে নেয়। আর নিম্ন শ্রেণীর অশিক্ষিত,দিন মজুর,শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা এদেরও আগে বিবাহ শাদী করে থাকে। কারণটা স্পষ্ট যে মধ্যবিত্ত লোকেরা তাদের সোসাইটিতে নিজেদের ব্যক্তিত্ব,মহত্ব,সম্মান তথা,ষ্টেটাস বজায় রাখতে গিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে। যার দরুণতারা তখন পর্যন্ত বিয়ে শাদীর চিন্তা করেণা যতক্ষণ না তারা বিয়ে ও পরবর্তি সময়ে চলার মত পর্যাপ্ত পরিমান অর্থ উপার্জন না করে নেয় অথবা উপার্জনের কোন ব্যবস্থা করে না নেয়। পেশাজীবিদের অবস্থাটা এদের চেয়ে ভিন্ন। কেননা তারা বিশ/বাইশ বছর বয়সে যা উপার্জন করে নেয় এটাই তাদের চলার মত যথেষ্ট হয়েছে বলে মনে করে থাকে। তাই তারা এই বয়সেই বিয়ে শাদী করে ফেলে। আর নিম্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের অবস্থাটা এদের চেয়ে ভিন্ন। কেননা সতের আঠার বছর বয়সেই তারা তাদের চলার মত উপার্জন করে নিতে সক্ষম হয়। তাই তারা এই বয়সে উপনিত হলে বিয়ে শাদী করে নিতে আর দেরি করেণা। গ) রুসম ও রেওয়াজ:- কিছু অনুন্নত গ্রাম্য এলাকায় এখনো এই প্রথা প্রচলিত আছে যে বিয়ের বয়স হলে কেবল বড়দেরকেই বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়। বড় ভাইকে বা বোনকে রেখে ছোট ভাই বা বোনের বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়না। এই প্রথা ইউরোপের কোন কোন দেশে প্রচলিত আছে। এজাতীয় আরও অনেক রুসম ও রেওয়াজের দরুণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে।

bvMwiKZ c`vb t

সাধারণত প্রায়ই দেখা যায় যে অনেক লোক উন্নত জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে নিজ মাতৃভুমি ত্যাগ করে কোন উন্নয়নশীল দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। উক্ত উন্নয়নশীলদেশ এধরনের বহিরাগতদেরকে নাগরিকত্ব প্রদান করে থাকে। এভাবে আস্তে আস্তে উক্ত জনসংখ্যা অনেক বৃদ্ধিপায়। বহুকাল থেকে ইংল্যান্ডের অনেক নাগরিক অস্ট্রেলিয়াতে বসবাস করে। (মা'শিয়াত পৃ: ৫-৭৮ মাওঃ হাবিবুর রহমান প্রণীত)
জনসংখ্যার ব্যাপারে মার্শালের এই আধুনিক চিন্তাভাবনা সামনে রেখে আপনি নিজেই এই সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারবেন যে মার্শাল এর মতেও ম্যালথ্যাসের মতবাদটা একেবারে সর্ব সাকুল্যে ছিল ভুল। কিছু বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে জনসংখ্যা ও জন্মহার বৃদ্ধি হচ্ছে দেখে ম্যালথাস গোটা বিশ্বের জনসংখ্যার ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন তাই তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণের এই ফর্মূলা আবিস্কার করেণ। এখন আর সে অবস্থা নেই। এখন জনসংখ্যার ব্যাপারে মার্শালের চিন্তা ধারার সারাংশ এটাই হলো যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। পরিস্থিতি যাই দেখা যাক সেটার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এর দ্বারাই জন্মনিয়ন্ত্রণের চাহিদা পূরণ হয়ে যায়। কোথাও আবহাওয়া,কোথাও সামাজিক প্রথা,কোথাও সন্তান লালন পালনের কষ্টের দরুণবিয়ে শাদী না করা। যার ফলে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি কমে । আবার কোন স্থানে প্রচুর লোকের দেশ ত্যাগের মাধ্যমে জনসংখ্যার ঘাটতি দেখা দেয়। যাই হোক, যারা আবেগের বশবর্তী না হয়ে নিরপেক্ষ ভাবে বিচক্ষণতার সাথে চিন্তা ভাবনা করেছে। তাদের বক্তব্য হলো যে গোটা পৃথিবীর সবটুকু ভুমি মানুষের বসবাসের জন্য যথেষ্ট না হওয়া অসম্ভব। এ বিষয়ে বর্তমানে "সাপ্তাহিক টাইম" ম্যাগাজিন এ একটি তথ্য ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে। যাতে বিস্তারিত প্রমানাদিসহ একথা বলা হয়েছে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আবেগের বশবর্তী হয়ে আগপিছ না ভেবেই জন্মনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক। এদের পরিণতি তাই হবে ম্যালথাসের

ভবিষ্যদ্বানীর হয়েছিল । এ বিষয়ের কিছু কথা সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠকদের উপকারার্থে তুলে ধরছি। টাইম ম্যাগাজিনের প্রতিবেদক তার নিবন্ধে লেখেন যে এজাতীয় ভবিষ্যদ্বানী যারা করেণ তারা বিজ্ঞানের এই সম্ভাব্য আবিস্কার এবং অকল্পনীয় উন্নত পরিবর্তনের কথা ভাবতেই পারে নাই । যেমনিভাবে ম্যালথাসের যুগে অস্ট্রেলিয়া,আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মত বড় বড় জমিন খালি পড়েছিল। এমনিভাবে এ যুগেও ”আমাজান বিজন” এর পুরা ভুখণ্ডের বিশ শতাংশ একেবারে খালি পড়ে আছে। কেবল ইথোইউপিয়া রাষ্ট্রের ১৮ কোটি একর এমন জমি খালি পড়ে আছে যা গোটা পৃথিবীর সর্বাধিক উর্বর জমি । এই এশিয়া,যার জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে যাচ্ছে বলে এত মাতামাতি করা হচ্ছে । এর ভিতরেও বিশাল বিশাল উর্বর ও ফসলের উপযোগী জমি অনাবাদ খালি পড়ে আছে। যেমন ফিলিপাইনের মিন্দানাও দ্বীপপূঞ্জ এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের পাথুরে জমিনের পুরা অংশটাই অনাবাদ পড়ে আছে। এছাড়াও আমেরিকার অঙ্গরাজ্য সমুহে দুই কোটি সত্তুর লক্ষ একর জমি শুধু এই কারনে চাষাবাদ পরিত্যাগ করা হয়েছে যে এতে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি উৎপাদন হচ্ছিল । এই বিস্তারিত তথ্যবহুল আলোচনা যদি আমরা আমলে না নিয়ে একথা মনে করি যে এই সকল অনাবাদী জমিগুলি আবাদ করা যাবেনা । তথাপি পৃথিবীর জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণের মত উপযোগী খাদ্যের উৎপাদন প্রচুর পরিমানে বাড়ানো যাবে । ১৯৫৯ সনে ভারতে তিন আরব ডলার শুধু খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে ব্যয় করেছিল । আর একথার স্বীকার করেছে যে বিগত কয়েক বৎসর থেকে প্রত্যেক বৎসর তিন লক্ষ থেকে চার লক্ষ টন শস্য আমদানী করেছে। যদি তাদের কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে ভারত তার উৎপাদন জাপানের মত দ্বিগুন তিনগুন বৃদ্ধি করেণা কেন? তাহলে এর কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাবে না ।ইন্ডিয়া এবং জাপানের কৃষিজাতপণ্য উৎপাদনের যে ব্যবধান তা কেবল এজন্য যে জাপানের কিষানরা তাদের জমিতে ফসলের উপযোগী ঔষধ,উন্নত বীজ এবং অধিক পরিমানে রাসায়নিক নির্জাস ব্যবহার করে থাকে। যদি ইন্ডিয়ান কিষানেরা এমন সতর্কতার সাথে জাপানী পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে তাহলে ইন্ডিয়ার উৎপাদন জাপানের তুলনায় কম হওয়ার কোন কারণ

নেই। বৃটেনের অর্থনীতি বিজ্ঞানী মাষ্টার কোলিন ক্লার্ক বলেন যে, *hw` cw_exi mKj wKlv‡biv Zv‡`i Drcv`bkxj Rwg ¸wj‡K nj¨v‡Ûi ew×gvb KlK‡`i gZ Dc‡hvMx K‡i PvI K‡i Zvn‡j eZgvb Rwgb †_‡KB Avi I 28 kZvsk Drcv`b ew× Kiv m¤¢e n‡e| Zvn‡j eSv‡Mj eZgv‡b †h Rwg Av‡Q Zv †_‡K hv Drcw`Z n‡"Q †mB cwigv‡bi Rwg †_‡KB Z_¨ chw³i e¨env‡ii gva¨‡g Avi I `k¸b Drcv`b ew× Kiv m¤¢e|* (সাপ্তাহিক টাইম নিউইয়র্ক ১৯৬০)

cwK¯—v‡bi RbmsL¨vi welqwU t

এবার আসুন দেখা যাক পাকিস্তানে (বাংলাদেশ সহ) জনসংখ্যার অবস্থাটা কি? এ বিষয়ের উপর আলোচনা করার পূর্বে নিম্নের প্রশ্নগুলির একটু উত্তর খুঁজে নেই তাহলে জনসংখ্যার বিষয়টা স্পষ্ট বুঝে আসবে। ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিকি সত্যিই লাগামহীন? খ) জীবনোপকরনের সাথে জনসংখ্যার তুলনামূলক সম্পর্ক কেমন? গ) যদি একথা সত্য হয় যে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে উপার্জন সে হারে বাড়ছেনা। তাহলে জন্ম নিয়ন্ত্রণই কি এর একমাত্র ব্যবস্থা ? ঘ) যদি জন্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়া অন্য কোন পন্থায় এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়ে যায় তাহলে কি হবে? এবার এই প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর বর্তমান বাস্তবতার নিরিখে খুঁজে দেখি তাহলে এই সমাধান গুলি আমাদের সামনে ভেসে উঠে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে পাকিস্ত ানের জনসংখ্যা আগের তুলনায় বাড়ছে। ১৯৪২-১৯৫১ এই দশ বছরে পাকিস্তানের (বাংলাদেশ সহ) জনসংখ্যা ৫-১০ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল ভারত থেকে প্রচুর লোকের পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করা। ১৯৫৭ সনের মাঝামাঝি পাঁচসালা পরিকল্পনা সরকার পেশ করেছিল। এর অনুমানের ভিত্তিতে পরবর্তী ছয় বৎসরের ভিতরে প্রতি বৎসরে জনসংখ্যা ১.৪ (এক দশমিক চার) শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এরপর ১৯৬১ সানের আদম শুমারী রিপোর্ট অনুসারে এই দশ বৎসরের ভিতর প্রতি বছর ১০ লক্ষ নবজাতকের আগমন হয়েছিল। ১৯৫১ সনে জনসংখ্যা ৮ কোটির কাছাকাছি ছিল,১৯৬১ সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৯

কোটিতে উপনিত হয়ে গেল। কিন্তু এই বাস্তবতা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা শুনে বিচলিত হতভম্ভ হয়ে দেশের আয়তন ও উৎপাদনের সম্ভাবনা থেকে চোখ বন্ধ করে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ হবেনা। বরং আমাদেরকে প্রথমে এটা ভেবে দেখতে হবে যে রাষ্ট্রের আয়তনের অনুপাতে এর ধারণ ক্ষমতা কতটুকু রয়েছে। এর উৎপাদন জনসংখ্যার তুলনায় কতটুকু সামঞ্জস্যশীল? দেশের আয়তনের কথা বলতে গেলে বলব যে এই দিক থেকে পাকিস্তানের জনসংখ্যা এখনও আশংকাজনক নয়, না অদূর ভবিষ্যতে এর তেমন কোন সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো একটি কৃষিপ্রধান দেশে এক মাইলের(চারদিক থেকে)২৫০ জন নাগরিক বসবাস করতে গিয়ে যাবতীয় প্রয়োজনাদি মিটিয়ে জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে। পাকিস্তান একটি কৃষি প্রধান দেশ। এর ৭৯ শতাংশ নাগরিক কিষান। আর এদেশে গড়ে এক মাইলের ভিতর ২০৮ জন নাগরিক বসবাস করে। সেই দৃষ্টিকোন থেকে এখনও প্রতি মাইলে ৪২জন নাগরিক অতিরিক্ত বসবাস করতে পারবে। আর এই ধারণ ক্ষমতা যথেষ্ট। তবে বর্তমানের উৎপাদিত ফসলের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে যদিও তা আরো অধিক ফলানোর তেমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এতটুকু ফসল বর্তমান জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট। আর যদি এই জমি গুলিতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা যায়,বুদ্ধি ও মেধা খাটিয়ে উন্নত সার ও বীজ সঠিকভাবে প্রয়োগ করতঃ পরিশ্রম করে চাষ করা যায় তাহলে বর্তমান জমি থেকেই অধিক ফসলের আশা করা যেতে পারে। আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ফসলের মধ্যে গম, ধান ও পাট অন্যতম। তার মধ্যে গমের ফলন প্রতিবছর ৩৭লক্ষ ৮৫ হাজার দুই শত ২০টন। যা বিশাল ভারতের উৎপাদনের তুলনায় প্রায় ৪১% বেশি। চাউলের উৎপাদন প্রতি বছর ৮৪ লক্ষ ৬১ হাজার থেকে কিছু বেশি যা গোটা ভারতের চাউলের তুলনায় প্রায় ৩৫% বেশি। গোটা বিশ্বের তুলনায় আমাদের দেশে পাটের উৎপাদন হয় প্রায় ৭৫%। মোট কথা বর্তমান উৎপাদন বর্তমান জনগোষ্ঠির জন্য যথেষ্ঠ। তবে এটা প্রচুর পরিমানে বাড়ানো যাবেনা হয়ত। (কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পরিসংখ্যান বর্তমানে প্রযোজ্য নয়,কারণ ধান,পাট ও গমের উৎপাদনের

জমির অধিকাংশ এলাকা বর্তমান পাকিস্তানের অংশে নেই। স্বাধীন বাংলাদেশের ভুখণ্ডে চলে এসেছে)। ৩) কিন্তু! তাই বলে তো একথা কিছুতেই মেনে নেয়া যেতে পারেণা যে,যদি বর্তমান উৎপাদিত ফসল বর্তমান জনগোষ্ঠির জন্য যথেষ্ঠ না হয় তাহলে এর একমাত্র সমাধান "জন্মনিয়ন্ত্রণ" তা কিন্তু কিছুতেই উচিৎ নয়,আমাদের জনসংখ্যাকে জেনে শুনে হ্রাস করে ভয়াবহ ক্ষতিকে নিজ হাতে বেছে নেয়া বুদ্ধি মানের কাজ হবেনা। তবে ভবিষ্যত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন করে আমাদেরকে চাষাবাদ তথা ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করার সর্বাত্বক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ৪) তাহলে এমন কি সম্ভাব্য পদ্ধতি আছে যার দ্বারা মন্দা অর্থনীতি থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি? তো এই প্রশ্নের বিভিন্ন বিশ্লেষণ এবং সম্ভাব্য পন্থার ব্যাপারে আমরা সামনে গিয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করব। যার দ্বারা আপনার কাছে একথা স্পষ্ঠভাবে বুঝে এসে যাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের এই ধ্বংসাত্বক পথ পাড়ি দেয়ার চেয়ে এর বিকল্প ও নিরাপদ রাস্তাও আছে। যেই রাস্তায় চলতে গেলে আমরা সকল সম্ভাব্য বিপদের মোকাবেলা করতে পারব। একমাত্র আল্লাহই আমাদের সহায়ক ও সাহায্যকারী।

AwfÁZv wK e‡j?

উপরোলিখিত বাস্তব বিবরণ দ্বারা একথা যথাযথভাবে স্পষ্ট হয়েছে যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা ইসলামের মূল নীতির ভিত্তিতে সঠিক নয়। সুস্থ্য বিবেক ও এটাকে প্রচলন করতে সায় দেয়না। তাদের এই তথাকথিত দলিলের পরে একজন সচেতন ব্যক্তির বিবেক শতভাগ এই নিশ্চয়তায় পৌঁছানো উচিৎ যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করা কিছুতেই সঠিক নয়। কিন্তু আফসোস আমাদের এই জাতির জন্য যারা দুশত বৎসর বৃটিশের দুঃশাসনে পিষ্ট হয়ে নিজেদের রাজত্ব,রাজনৈতিক সম্মান,মর্যাদার পাশাপাশি সকল উন্নত ও স্বাধীনচিন্তা ধারা সকল যোগ্যতাগুলিকে পর্যন্ত ইউরোপের কসাই খানায় বলি দিয়েছে। আমাদের জাতির ভোতা অনুভুতি এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে আজকে আমাদের মনে সেই সব কথা ও মতবাদকে স্থান দিতে চাইনা যদি তা ইউরোপ তথা পাশ্চাত্যের সরাসরি আমদানীকৃত না হয়। চাই এই ভাল কথা বা মতবাদের স্বপক্ষে কোরআন

সুন্নাহর শতদলীলই পেশ করা হোক না কোন, অথবা নির্ভরযোগ্য যুক্তি গ্রহণ যোগ্য প্রমানাদীর যত স্তোপই পেশ করা হোক না কেন, তবুও আমাদের দিল তা গ্রহণ করতে চায়না। বরং এটা জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে যে এব্যাপারে ম্যালথাস কি বলেছেন? নিউটন কি চিন্তাভাবনা করেছেন? বার্নার্ড এর মতবাদ কি? পরিশেষে ঐ মতবাদকে শেষ কথা মনে করি যা কোন পশ্চিমা বুদ্ধিজীবির মাথা থেকে নতুন ভাবে উদগত হয়ে অস্তিত্ব লাভ করেছে। কোরআন সুন্নাহ্ কি বলে? বিবেক কি পছন্দ করে? এগুলি এমন সব প্রশ্ন যা মেধা অনুকরণের এই যুগে বিধ্বস্থ হয়ে গিয়েছে। এই জন্য এখানে একথাটা বলে দেয়া যথার্থ হবে যে ইউরোপের যেসব দেশে এই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু করেছে,তারা এর ফলাফল কি পেয়েছে? পরিশেষে তারা এই কাজের ব্যাপারে কি অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে? জন্মনিয়ন্ত্রণের মতবাদ প্রায় ৭০-৮০ বৎসর পূর্ব হতে ইউরোপের দেশ সমুহে জমজমাট ভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে। এই দীর্ঘ সময়ের ভিতরে একটা আন্দোলনের ভালমন্দ যাচাই করার জন্য যথেষ্ট। এটা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার প্রসার হয়েছে। আর এই মতবাদের বহুবার যাচাই-বাচাই করা সম্ভবপর হয়েছে। সে সব দেশে এই জন্মনিয়ন্ত্রণের কি কি ভয়ানক ক্ষতিকারক দিক প্রকাশ পেয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ।

1. ‡h †kYxi gvbl Zjbvi evB‡i t

ইংল্যান্ডের "জেনারেল রেজিষ্ট্রার" এবং "ন্যাশনাল বার্থ রেট কমিশন' এর যাচাই অনুসারে জানা যায় যে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচলন অধিকাংশ অভিজাত শ্রেণী ও মধ্যম শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। বেশির ভাগ উচ্চ বেতন ভোগী আমলা,বড় বড় ডিগ্রীধারী শিক্ষিত,শাসক,ব্যবসায়ী শিল্পপতিরাই এই মতবাদের অনুসারি। নিম্ন শ্রেণীর গরীব লোকদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচলন শুণ্যের কোটায়। তাদের মধ্যে বিলাস বহুল জীবন যাপনের উচ্চাকাঙ্খা নেই। সবচেয়ে বড় কথা এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে এখনো সেই প্রাচীন কার্যক্রম রয়েগেছে যে

পুরুষেরা রোজগার করবে আর নারীরা ঘরের ভিতরের কাজ সামাল দিবে। যার দরুণতাদের মধ্যে অর্থ সংকট,দারিদ্রতা বিদ্যমান থাকা সত্বেও তারা জন্মনিয়ন্ত্রণকে জরুরী মনে করে না। যার ফলে এদের মধ্যে জন্মহার অনেক বেশি হয়ে থাকে। আর এর সম্পূর্ণ বিপরীত অভিজাত ও মধ্যম শ্রেণীর লোকদের মধ্যে জন্মহার থাকে অনেক কম। বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন লোকদের মধ্যে প্রতি হাজারে জন্মহার নিম্নরূপঃ-

শ্রেণী	প্যারিস	বার্লিন	ভিয়েনা	লন্ডন	হিমবার্গ
অতি দরিদ্র শ্রেণী	১০৮	১৫৭	২০০	১৪৭	১৫১
দরিদ্র শ্রেণী	৯৫	১২৯	১৬৪	১৪০	
স্বচ্ছল শ্রেণী	৭২	১১৪	১৫৫	১০৭	
ধনী শ্রেণী	৫৩	৬৩	১০৭	৮৭	
অভিজাত শ্রেণী	৩৪	৪৭	৭১	৬৩	৫৯

এই পরিসংখ্যান ও অনেক পূরনো,ইংল্যান্ডের পরবর্তি সংখ্যা খুব খারাপ কেন না এখন ইংল্যন্ডের দরিদ্র শ্রেণীতে এই মহামারির প্রভাব লক্ষণীয়ভাবে বাড়ছে, এখন এই শ্রেণীর জন্মহার ৪০ এ পৌছে গিয়েছে। আর সেখানকার মধ্য ও উচ্চবিত্তদের মধ্যে জন্মহার আরও কমে গিয়ে এখন ১৬ তে নেমে গিয়েছে। এর কারণ সেখানকার লোকদের মধ্যে গতর খাটার লোকদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই সাথে মেধাবী ও বুদ্ধিমান লোকদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে যারা নেতৃত্ব ও কর্ম পারঙ্গম ছিল। এটা মেধাবী লোকদের হ্রাস পাওয়ার অশনি সংকেত। আর তা হতে থাকলে সেই জাতি ভবিষ্যতে মাথা উচু করে দাড়াতে পারবেনা। আর এই বিষয়টার ভবিষ্যত বাণী ডাঃ এফ ডব্লিউ, টাসিং করেছিলেনঃ

GB Kvi‡bB m”Qj †kYxi †jvK‡`i g‡a¨ Rb¥wbqš‡Yi cwZ †SvK _vKvi `i“Y Zv‡`i GB AvksKv †`Lv †`q †h bvMwiK‡`i †mŠ›`h wewjb n‡q hv‡e| Avjvn c`Ë †hvM¨Zvm¤úb †jvK Kg Rb¥v‡e,Avi

hvivB Rb¥vq Zviv I Zv‡`i GB †Lv`vc`Ë cwZfvUv‡K Kv‡R jvMv‡bvi Rb¨ ev¯‡e †Kvb fwgKv ivL‡Z cvi‡ebv| Gi wecixZ wbg †kYxi Rb‡Mwô‡Z Rb¥ nvi Le †ewk n‡q \_v‡K †Zv G‡`i g‡a¨ I DËg I †hvM¨Zv m¤úb †jvK wKQ cq`v nq| wKš †MvUvRwZ Zv‡`i †_‡K †gavex †jvK Le KgB †c‡q _v‡K| এই ফলাফল আমাদের দেশেও বেশ প্রকাশ পায়। আল্লাহ না করুণআমরাও যদি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এদেশে চালু করি। কেননা আমাদের জনগণের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের তেমন কোন আগ্রহ পাওয়া যায়না। সাম্প্রতিক লন্ডনের একটি মাসিক পত্রিকায় এবিষয়ে একটি কার্টুন ছাড়া হয়েছিল যাতে ছিল জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রকার। এ কার্টুনে দুইটি পরিবারের চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। একটি পরিবার ছিল ছোট,মাত্র ২টি সন্তান ও মা বাবা। তাদেরকে খুব সুখি দেখানো হয়েছে। অপর দিকে এক বিশাল পরিবারের চিত্র দেখানো হয়েছে যেথায় অনেক সন্তানাদী,পরিবারের কর্তা ব্যক্তিটি এদের ভরণপোষণ দিতে না পারায় সবার মধ্যে হতাশা,দুঃখ যাতনার ছাপ পরিলক্ষিত। এই কার্টুন যখন আমাদের দেশের সাধারণ জনগনের মধ্যে প্রচারের জন্য বিলি করা হলো তখন দেখা গেল তারা ঐ পরিবারকেই গ্রহণ করল যাতে সদস্য সংখ্যা অনেক বেশি। এই কার্টুন দ্বারা যদিও জন্ম নিয়ন্ত্রণের সুফল এবং বড় পরিবারের কষ্টের চিত্র দেখানো হয়েছে। তথাপি এতে এদেশের জনসাধারণের আগ্রহের বিষয়টি লক্ষণীয় যে তারা এসব ফালতু প্রচারে বিশ্বাসী নয় বরং তারা প্রাকৃতিক পদ্ধতিটাকেই বেশি ভালবাসে। আর বাস্ত বেও তাই। বার্থ কন্ট্রোল, শহরের আধুনিক কিছু শিক্ষিত লোকের মধ্যে চলতে পারে কিন্তু আপামর জনসাধারণ এটা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়, যে সম্প্রদায়কে পৃথিবীর সর্বাধিক উন্নত সম্প্রদায় মনে করা হয়(বৃটিশ)তারাই পারে নাই এদেশের সরল প্রাণ মানুষের মধ্যে তথাকথিত এই “উন্নত পদ্ধতি” চালু করতে। আর গোটা পাকিস্তান জুড়ে এ ধরনের নাগরিকদের সংখ্যাই বেশি। জনসংখ্যার মোট ৮৪.৭ শতাংশ অশিক্ষিত এবং এ জনসংখ্যার ৮৯.৬ শতাংশ গ্রামে বসবাস করে। তাদের মধ্যে যদি এই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রচলন করা হয় তাহলে এরফলে শিক্ষিত, সভ্য চিন্ত াধারার লোক সংখ্যা কমে যাবে। দেশভরে যাবে ঐ লোকদের দ্বারা যারা

হবে নিষ্কর্মা,অদক্ষ । মেধাবী,কর্মদক্ষ,পৃথিবীটাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার মত পারদর্শী লোকের সংখ্যা কমে যাবে । এটা কি জাতির এক বিরাট অপুরণীয় ক্ষতি নয় ?

2. e¨vcK fv‡e Zvjv‡Ki cPjb t

পিছনে পড়ে এসেছেন যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের দ্বারা দাম্পত্ব সম্পর্কে ভাটা পরে । স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে সন্তান সেতু বন্ধনের মত কাজ করে । সন্তান না থাকলে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়া খুব সাধারণ ব্যাপার । আর এ কারণেই ইউরোপে তালাকের প্রচলন খুব দ্রুত হারে ছড়িয়ে পরছে । আর তালাকের ঘটনা সেই সব দম্পতিতেই অধিক হারে প্রতিভাত হয় যারা নিঃসন্তান ।

3. Rb¥nvi nvm cvIqv t

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে যারা এই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে । তাদের সন্তানদের জন্মহার বিপদ জনক ভাবে হ্রাস পেয়ে ১৮৭৬ ইং সনে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল । এর পর থেকে জন্মহার আশংকা জনকভাবে হ্রাস পেতে লাগল । উদাহারণ স্বরূপ ইংল্যন্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে । সেখানকার জন্মহার ১৮৭৬ সনে প্রতি হাজারে ছিল ৩৬.৩ । এরপর ১৯২৬ সনে হয়েছে ১৭.৮ । জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলাফল আরও বিস্তারিত ভাবে জানতে হলে জন্মহার এবং বিবাহের হার উভয়টা একটু তুলনাকরে নেয়া যেতে পারে । তাহলে জানা যাবে যে ১৮৭৬ সন থেকে ১৯০১ সন পর্যন্ত বৈবাহিক সম্পর্কে ৩.৬ পার্সেন্ট হ্রাস পেয়েছে । ১৯০১ সন থেকে ১৯১৩ সন পর্যন্ত বিবাহের গড় যা ছিল তাই বহাল থাকল কিন্তু! জন্ম হার ১৫.৫ হ্রাস পেয়েছ । ১৯১২ থেকে ১৯২৬ এর মাঝামাঝি বিভিন্ন শহরে বিবাহ ও জন্মহারের যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা

পাঠকদের সুবিধার্থে নকশা আকারে নিম্নে প্রদান করা হলো॥

‡`k mgn	weev‡ni Mo	Rb¥ nvi
ফ্রান্স	৭.৬ পার্সেন্ট বৃদ্ধি	২৮.২ পার্সেন্ট হ্রাস
জার্মানী	৯.৪ পার্সেন্ট হ্রাস	৪৯.৪ পার্সেন্ট হ্রাস
ইটালী	৯.৮ ” ”	২৯.১ ” ”
হল্যান্ড	১০.৩ ” ”	৩৫.৬ ” ”
সুইডেন	১১.৩ ” ”	৪৫.১ ” ”
ডেনমার্ক	১২.৩ ” ”	৩৫.২ ” ”
ইংল্যান্ড	১৩.৩ ” ”	৫১.০ ” ”
নরওয়ে	২৬.০ ” ”	৩৮.০ ” ”

জন্মহার দিন দিন এত হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও সেই সব দেশে জনসংখ্যা এত অধিকহওয়ার কারণ হলো: চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাদের ব্যাপক উন্নতি এবং গণ স্বাস্থ্য সচেতনতার দরুণ ব্যাপক মৃত্যু ঝুকি কমাতে অনেকটা সফল হওয়া। সেই সব দেশে জনসংখ্যার এই প্রবৃদ্ধি দেখেই ম্যালথাস তার থিউরি পেশ করেছিল। আর ঐ বছরেই বসন্ত ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধক টিকা আবিস্কার হয়েছিল। কোন কোন বিশেষজ্ঞদের মতে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরপরই যে বিরাট প্রলয়ংকারী জলোচ্ছাস হয়েছিল এতে ৫০ শতাংশ মানুষের বেঁচে যাওয়ার অন্যতম কারণ ছিল যে সঠিক সময়ে আক্রান্তদের নিকট জরুরী ঔষধ সামগ্রী পৌঁছে দেয়া। (টাইম উইকলি,১১ জানুয়ারী ১৯৬০ইং) কিন্তু! এতদসত্ত্বেও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলাফল এই দাড়াল যে জন্ম হার ও মৃত্যু হার এর মধ্যে খুব বেশি ব্যবধান রইলনা। যদি জন্মনিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি গণস্বাস্থ্য সচেতনতার এই উন্নতি না হত তাহলে মৃত্যুর হার জন্মহারের তুলনায় অধিক হত না। (অর্থাৎ এই বিপর্যয়ের পরলোক সংখ্যা খুব কমে যেত, কিন্তু জন্ম নিয়ন্ত্রণের দরুণলোক সংখ্যা বাড়তো না।) বিশেষ করে ফ্রান্সের অবস্থা ছিল সবচেয়ে বিপদজনক। ১৮৭৬ সনে এর জন্মহার ছিল ২৬.২ পার্সেন্ট। এরপর ১৯৪১ সনে থেকে প্রতি বছর আশংকা জনক হারে হ্রাস পেতে লাগল। একপর্যায়ে ১৯৪১ সনে জন্মহার গিয়ে দাড়াল ১৬.৫ পার্সেন্টে এবং মৃত্যুর

হার ১৫.৭ তে। এই অবস্থা দেখে অধিকাংশ ফ্রান্সের নাগরিকদের চোখ খুলে গেল। সেখানকার বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ নাগরিকগণ এই আওয়াজ উঠালোঃ

Òevm evm, mwwK AvIi bv fiYv,
jvM Mv‡q jvM Mv‡q ûk wVKv‡b|Ó
Òevm, evm, Avi Xvj‡ebv eÜ Mv‡m GK †dvUv g`,
†bkv †j‡M‡Q AvR KwVb fv‡e|Ó

একটি আন্দোলন,জাতীয় আন্দোলন,জনসংখ্যা বৃদ্ধির আন্দোলন নামে শুরু হয়েছিল এই আন্দোলন। (ফ্রান্স) সরকার জন্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা প্রচার প্রসারকে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করল। জনসংখ্যা বাড়ানোর জন্য প্রায় এক ডজন নতুন আইন প্রয়োগ করল। যার দরুণ অধিক সন্তান জন্ম দানকারী পরিবারকে আর্থিক সহযোগীতা,ইনকাম টেক্সে শিথিলতা। বেতন, পারিশ্রমিক,পেনশন বৃদ্ধি করা হলো। মোটকথা,আইনি,অভ্যাসগত পরিবর্তনের মাধমে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিপরীত উৎসাহ ও উদ্বুদ্ধকরণের যাবতীয় প্রচেষ্ঠা অবলম্বন করে খুব কষ্টে সরকার জন্মহার বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। এখন সেখানকার ফ্যামিলিপ্লান তথা পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা,জন্মনিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে এই পন্থা অবলম্বন করলো যে প্রত্যেকটা পরিবারকে সরকার শুধু নবজাতকের খাদ্য,বাসস্থান ও লালন পালনের সাহায্য সহযোগীতাই করেণা বরং তার জন্ম হওয়ার আরও অনেক পূর্ব হতেই তার আগমনের প্রস্তুতি চলতে থাকে। কখনো দেখা যায় সন্তান না হওয়ার কারনে এদের চিন্তা,পেরেশানী করতে। যখন কোন যুবক যুবতী বিবাহের প্রস্তুতি নিতে থাকে তখন বিবাহের পূর্বেই এদেরকে (মেডিকেল চেকআপ) চিকিৎসকদের শরণাপণ্য হতে হয়। তখন ডাক্তার এই সিদ্ধান্ত দেয় যে এই দম্পতির সমন্বয়ে সুস্থ্য সন্তান হওয়া সম্ভব কিনা? তারা সন্তানের জন্ম দেয়ার মত উপযোগী কিনা? এরপর বিবাহের পরে যখন সন্তান পেটে আসে,তখন গর্ভবতি মা সর্বক্ষণ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থাকে আর সেই ডাক্তার এই মা'র সন্তান প্রসব হওয়া ও এর

পরবর্তি যাবতীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান করার যাবতীয় জিম্মাদার হয়ে যায়। সন্তান জন্ম হওয়ার পর থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত প্রত্যেক বাচ্চাকে সরকারি খরচে স্কুলে ফ্রি পড়ালেখার ব্যবস্থা করানো হয়। ১৯৪৬ ইং হতে প্রত্যেক বছর বিবাহিত অবিবাহিত অভিবাবককে এর সুবিধা দেয়া হয়। এই সুবিধা পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বাচ্চার পিতা মাতা হওয়া জরুরী নয়। আসল ব্যাপার হলো সে যেন তার অধীনস্ত বাচ্চার যথাযথ প্রতিপালন করে। ৭ হাজার ইন্সপেক্টর এবং ডাক্তার,৬ হাজার সামাজিক কর্তা ব্যক্তিবর্গ ও আইনের লোকজন পিতামাতার মত এই লোকদের খোঁজ খবর রাখে যে এই অভিভাবক শ্রেণীর লোকগুলি সরকারী সুবিধাদী পাওয়ার পর এরা সংশ্লিষ্ট বাচ্চাদের যথাযত ব্যবস্থা ও লালন পালন করছে কিনা ? লোকদেরকে বাচ্চাদের পরিমান অনুসারে এদের জীবন যাপনের যাবতীয় সুবিধাদি প্রদান করা হয়। ইনকাম টেক্সের ব্যাপারে এদেরকে ছাড় দেয়া হয়। এছাড়া অন্যান্য আরোও অনেক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়। বিশেষ করে ট্রান্সপোর্টে বাস,ট্রেনের ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে এদেরকে অভিবাকত্ব কার্ড প্রদান করা হয়। এর দ্বারা তারা সহজেই ভ্রমণ সুবিধা ভোগ করতে পারে। সাধারণ নাগরিকদের মত লম্বা লাইনে দাড়িয়ে থাকতে হয়না। (সাপ্তাহিক সিহাব লাহোর ৪ ডিসঃ ১৯৬০ইং)

এই সকল আইন প্রয়োগ করার ফলে জন্মহার আশানুরূপ বাড়তে লাগল। ১৯৪৭ ইং সনের বিশ্ব আদম শুমারীতে প্রকাশ পেল যে ফ্রান্সের জন্মহার ২১.০ (প্রতি হাজারে) এবং মৃত্যুর হার প্রতিহাজারে ১২.২।

ইটালি,জার্মানীতে ও প্রায় একই ধরনের হিসাব দেখা গেল। ১৮৭৬ সনে জার্মানীর জন্মহার ৪০.৯। আর ইটালির ৩৯.২ ছিল। প্রায় ১৯৪১ সন পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে হ্রাস পেল। ১৯৪১ সনে জার্মানীর জন্মহার গিয়ে দাড়ালো ১৫.৯ এ। কিন্তু যেহেতু সেই বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় নেতৃত্বে আসার পর এই অশনি বিপদের কথা চিন্তা করল যে যদি আমাদের জন্মহার হ্রাস পেতে থাকে তাহলে একটা সময় এমন আসতে পারে যখন আমাদের এই জাতি বন্ধ্যা হয়ে যাবে। আর বর্তমানের এই উন্নয়ন মূলক কাজের ধারা অব্যাহত রাখতে পরবর্তিতে কোন লোক অবশিষ্ট থাকবেনা। আর এই প্রেক্ষিতেই জন্মনিয়ন্ত্রণমূলক শিক্ষা ও প্রচলনকে আইনগত ভাবে বন্ধ করে

দিয়েছে। নারীদেরকে কারখানা,অফিস আদালত থেকে অব্যাহতি দিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে,যুব সমাজকে বিবাহের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে 'মেরিজ লোন' নামে আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। ১৯৩৪ সানে এককোটি পাউন্ড অর্থ কেবল বিবাহের ঋণ বাবদ ব্যয় হয়েছে। যার দরুণ ছয়লক্ষ নারী-পুরুষ উপকৃত হয়েছে। ৩৫ সনের এই আইন প্রয়োগ করা হয়েছে যে একটা সন্তান জন্ম দিলে তার ইনকাম টেক্সের ১৫ পার্সেন্ট ২টা সন্তান জন্ম দিলে ৯৫ পার্সেন্ট হ্রাস করা হবে। আর যদি ৩টা সন্তান কেউ জন্ম দেয় তাহলে তার ইনকাম টেক্সের সবটাই সে মাফ পেয়ে যাবে।

ইটালিতেও এই সকল পদ্ধতি/পরিকল্পনা গ্রহণ করে জন্মহার হ্রাস হওয়ার এই মারাত্মক ক্ষতিকে প্রতিহত করা হয়েছে। তাইতো ১৯৪৮ সনের আদম শুমারীতে প্রকাশ পায় যে ইটালির জন্মসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধিপেতে লাগল। ঐ বছর ইটালির জন্ম হার ছিল ১৬.৫ (প্রতিহাজারে)।

4. Aeva †hŠbvPvi I e¨vcK †hŠb‡ivM t

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করা চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতি। আর জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে যারা অসৎ উপায় অবলম্বন করে তারা এসব যৌন রোগে আক্রান্ত হবে অনায়াসেই। তাই এই উভয়টা বিষয় সেই সব দেশেই (পাশ্চাত্য) অধিক পরিমানে পরিলক্ষিত হয়। ডাঃ ম্যারি শারলীপ তার চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলাফল এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ *RbwbqšY c×wZ PvB cvKwZK †nvK A_ev †Kvb wcj,ewo RvZxq,KbWg A_ev Ab¨‡Kvb cšv,G¸wj Aej¤b Kivi Øviv hw` I Zvr¶wYK †Kvb Lvivc cwZwµqv †`Lv hvqbv wKš GKUv `xN mgq chš e¨envi Kivi Kvi‡Y Aa eq‡m †cŠQvi Av‡M Av‡MB bvix‡`i kixi AmgZj/Agmb n‡q hvq,¤vb n‡q hvq| cùwUZ I jveY¨ nxbZv, gbgiv ¯fv‡ei i"¶Zv, D‡ËwRZ ¯fv‡ei n‡q hvIqv,welb wPšv avivi fxo,wb`vnxbZv,nZewׅ×,gvbwIK `ejZv,i³ PjvPj K‡g hvIqv,nvZ-cv Aem n‡q hvIqv,kix‡ii †Kvb †Kvb ¯v‡b †dvov ev GRvZxq ¶Z*

n‡q hvIqv,gwmK FZmv‡e Awbqg †`Lv †`qv BZ¨w` me Rb¥wbqšY c×wZ Aej¤b Kivi AeawiZ cwiYwZ| Gi †P‡q I eo mgm¨v nj Rb¥wbqšY c×wZi e¨vcK cPj‡bi Øviv †h‡nZ A‰ea mšvb n‡q hvIqvi AvksKv \_v‡Kbv,j¾v,kig †Zv Avi I Av‡MB LB‡q‡Q| hvi d‡j A‰ea Aev` †hŠbvPvi mgv‡Ri i‡› i‡› †cv‡Q hv‡"Q|
ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটির যৌন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর "আল ফিরিডার্সি কানজে এর ভাস্য মতে ঃ *Av‡gwiKvq 100-95 cv‡m›U ci"l Ges 85 cv‡m›U bvix A‰ea †hŠbvPv‡i wjß n‡q _v‡K|* (দৈনিক জং, ৯/৮/৫৩ ইং) আর একথা কে না জানে যে অবাদ যৌনাচার এত ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলে শারীরিক সুস্থ্যতা ও চরিত্র একবারে ধ্বংশ হয়ে যায়। মোট কথা, আজ থেকে অনেক পূর্বেই ইংল্যান্ড,ফ্রান্স,জার্মানী,ইটালী এবং সুইডেনের মত দেশে প্রকৃতির সাথে ঘাতকতার (আত্নঘাতি সিদ্ধান্তের) দৃষ্টান্ত মূলক পরিণতি দেখে ফেলেছে। এরপরও যদি আমরা এই কথা ভাবতে থাকি যে যেহেতু সেই সকল উন্নত দেশে এই পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে,সুতরাং আমরাও এর প্রচলন করব। তাহলে আমাদের উদাহারণ ঐ বোকার মতই হবে যে কোন বীর বাহাদুরকে কূপে নিমজ্জিত হতে দেখার পরও এই ধারণা করে কুপে নামে যে সে হয়ত ব্যয়াম করছে বা সাতার কাটছে তাহলে এই বোকার মৃত্যু তো অনিবার্য।

Rb¥wbqš‡Yi ce³v‡`i `jxjw` t

এবার একটু ঐদিকে দৃষ্টি ফিরানো যেতে পারে যে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রবক্তারা কি কি দলীলাদি পেশ করে?

kiqx `jxj

১। জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রবক্তাদের সাথে যদি মাযহাবী দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনা করা হয় তখন তারা জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে ঐ সব হাদীস পেশ করেণ যার দ্বারা আযল জায়েজ হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন হযরত জাবের (রাঃ)এর বর্ণিত নিম্নের হাদীস খানাঃ *Avgiv ivmj (mvt) Gi*

cÖeÎ h‡M Avhj KiZvg Avi GK_v bexwR (mvt) I Rvb‡Zb wKš wZwb Avgv‡`i‡K Gi †_‡K evi Y K‡iY wb|

কিন্তু! কত বড় দুঃখজনক কথা যে এই লোকগুলো আযল নাজায়েজ হওয়ার মত স্পষ্ট দলীল ও ছহীহ হাদীস গুলিকে এড়িয়ে যান।

জন্মনিয়ন্ত্রণের শরয়ী অধ্যায়ে আপনারা দেখে এসেছেন যে এর পক্ষে বিপক্ষে উভয় প্রকার হাদীস ও দলীল সমূহ সামনে রাখলে কি কি ফলাফল বের হয়? এটা একটা মারাত্বক মৌলিক ভুল যে দু' একটা হাদীস দেখেই একটা বহুল আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয়া,সমুদ্রের উপকূলে দাড়িয়ে গোটা সমুদ্রের পানির গভীরতা মাপা ও অনুমান করার মত চরম বোকামী ছাড়া আর কি? জলের গভীরতা ও সমুদ্রের প্রশস্ততা জানতে হলে সে সব দুঃসাহসিক নাবিক ও ডুবুরীদের কাছে জিজ্ঞেস করুণযারা জীবন বাজি রেখে পাহাড়সম ঢেউয়ের সাথে মোকাবেলা করে সমুদ্র পাড়ি দেয় ও মুক্তা কুড়িয়ে এনে তবেই ক্ষান্ত হয়। সে সকল বরেন্য,শ্রদ্ধাভাজন জগৎ বিখ্যাত আলেম সমাজ,যারা এলমে দ্বীন আহরণ ও গবেষণা করতে করতে তাদের জীবনটাই বিসর্জণ দিয়েছেন,তাঁরা সে সকল হাদীস সমূহকে (গবেষণা করে করে) চুলছেড়া বিশ্লেষণ করে উম্মতের জন্য যে ফলাফল বের করেছেন তা আপনারা পূর্বেই অবহিত হয়েছেন। এবার আপনার নিজের বিবেককেই প্রশ্ন করুণ যে সে সব বিজ্ঞজনদের বের করা ফলাফল বেশি গ্রহণ যোগ্য হবে? নাকি ঐ সকল নামধারী মৌলভীদের (?) যারা দু' একটা হাদীস দেখেই যেনতেন ব্যাখ্যা করে একটা ফতুয়া মেরে দিল? এই মৌলিক জবাবের পরে এবার আসুন এই সম্পর্কিত একটি সন্তোষজনক জবাবও জেনে নেই। যে যুগে প্রিয় নবী (সাঃ) আযলের অনুমতি দিয়েছিলেন তখন আরবের লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন কারণে ব্যক্তিগত ভাবে কেউ কেউ আযল করত। সে কারণগুলি হলো ঃ ১) বাঁদীর সাথে আযল করত যাতে করে ঘরের কাম কাজে কোন বিঘ্নতা সৃষ্টি না হয়।

২) যাতে সে বাঁদী উম্মে ওয়ালাদ না হয়ে যায়। অর্থাৎ বাঁদীর গর্ভ থেকে মনীবের সন্তান হলে সে বাঁদীকে উম্মে ওয়ালাদ বলা হয়। (মনীবের সন্তানের মাতা) তখন আর এই বাঁদীকে বিক্রি করা যায় না। একে আজীবন

তার নিকটেই রাখতে হয়। কেননা উম্মে ওয়ালাদ বাঁদীর ক্রয় বিক্রয় হারাম। (এই জন্য মনীবরা বাঁদীর সাথে আযল করত)
৩) বাচ্চার দুধ পান করা কালিন সময় বাচ্চার মা'র সাথে আযল করা হত। যাতে এই অবস্থায় আরেকটি বাচ্চা পেটে না এসে যায়। তাহলে বর্তমান বাচ্চার সুস্থতা ও লালন পালনে বিরাট ঘাটতি দেখা দিবে যা পূরণ হবার নয়। এরপর আযল করা রাসূলের (সাঃ) অপছন্দ হওয়ার পাশাপাশি জায়েজও ছিল। তবে শর্ত হলো এটা যেন শরীয়ত পরিপন্থি ও নাজায়েজ উদ্দেশ্যে না হয়। এই জন্য রাসূল (সা.) আযল করাকে সরাসরি নিষেধও করেণ নাই। তবে সাহাবাদের আযল করার পিছনে যদি তাদের ব্যক্তিগত এমন কোন বিষয় হত যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষেধ,আপত্তিকর তাহলে রাসূল (সাঃ) অবশ্যই নিষেধ করতেন। এই কথার দ্বারা ঐ ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে যে নবী করীম (সাঃ) এর নিকট এক ব্যক্তি এসে তার স্ত্রীর সাথে আযল করার অনুমতি প্রার্থনা করল। রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন যে তুমি কেন এমনটা করতে চাচ্ছ ? সে যুক্তি দেখালো যে, আমার বর্তমান বাচ্চাটা খুবই ছোট্ট দুধ পান করে। এই অবস্থায় যদি তার মা আবার গর্ভ ধারণ করে তাহলে এর দুধ কমে যাবে। রাসূল (সাঃ) বললেন যে রোম পারস্যের লোকেরা এমন করে থাকে অর্থাৎ ছোট বাচ্চা থাকা সত্যেও আবার বাচ্চা নেয়, কিন্তু তাদের কোন সমস্যা হয়না।[6] এই ঘটনায় রাসূল (সা এর কাছে আযলের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে রাসূল (সাঃ) সাথে সাথেই এটা জায়েজ না জায়েজ হওয়ার ফতুয়া দিয়ে দেন নাই। বরং প্রশ্নকারীকে বললেন যে এই প্রশ্ন দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কি? এরপর যেহেতু এই প্রশ্নকারীর কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিলনা বরং অন্য লোকদের অভিজ্ঞতার

---

[6] "নোট: আশ্চর্য কথা যে কিছু লোক এই হাদীসটাকেই জন্মনিয়ন্ত্রনের পক্ষের দলীল হিসেবে নিয়েছেন এভাবে যে "আখাফু আলা ওয়ালাদিহা- এর ভাবার্থ নিয়েছে যাতে সে দরিদ্র না হয়ে যায়। অথচ হাদীস সাশ্রের উপর যাদের নূনতম ধারণাও আছে তারা এমন সাংঘাতিক ভুলটা কিছুতেই করতে পারেনা। কেননা রাসূল (সাঃ) ঐ ব্যক্তির জবাবে যা বললেন- এর এই অর্থ দাড়ায় যে দুধ পান করা অবস্থায় আবার
অন্তঃসত্বা হওয়ার দ্বারা বাচ্চার শারীরিক ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাচ্চার বাবার আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনার কথা এই হাদীস থেকে নেয়া কিছুতেই যথার্ত নয়।"

আলোকে এই চিন্তাটা অযথা,একথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে তাই এরকম চিন্তা যে অযথা,অসাড়,এটা তিনি স্পষ্ট করে দিলেন আর আযল করা যে মাকরূহ একথার উপর স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করলেন । এবার আপনি নিজেই বিবেক খাটিয়ে এই ফলাফল বের করতে সক্ষম হবেন যে আযলকারীর উদ্দেশ্য যদি না জায়েজ অথবা শরীয়ত পরিপন্থি কিছু হত! তাহলে রাসূল (সাঃ) অবশ্যই এটা থেকে বিরত রাখতেন ।

এই ব্যাখ্যা দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে যেই অবস্থার প্রেক্ষিতে আযল জায়েজ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এরদ্বারা বর্তমান জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনকে কিছুতেই বৈধতা দেয়া যায়না। প্রথমত এই জন্য যে তখনকার লোকদের (সাহাবাদের) উদ্দেশ্য সৎ ছিল। দ্বিতীয়ত এই জন্য যে তখনকার সময় ব্যক্তিগত পর্যায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা হত। সামগ্রীক ভাবে এর কোন প্রচলন ছিলনা। এবার আসুন জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য এই যুগে ইসলামী মুলনীতি গুলোর স্বপক্ষে আছে না কি নাই? এর জবাব গুলি নিম্নের কোরআনের আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে সামনে এসে যায় ।

১। "লাতাকতুলু আওলাদাকুম খাশ্‌য়াতা ইমলাক,নাহনু নারযুকুহুম ওয়া ইয়্যাকুম" (৩১-বনী ইসরাঈল)

A_ t †Zvgiv `wi`Zvi f‡q †Zvgv‡`i mšvb‡`i‡K nZ¨v K‡ivbv,Awg Zv‡`i‡K (Av¸šK mšvb‡`i‡K) wiwRK w`‡q \_wK Ges †Zvgv‡`i ‡KI|

২। "ওয়ামা মিন দাব্বাতিন ফিল আরদি ইল্লা আলাল্লাহি রিযকুহা ইয়া'লামু মুস্তাকাররুহা ওয়া মুস্তাওদিউহা ।"(৬-হুদ)

A_ t f-c‡ô wePiYKvix Ggb †KD †bB hvi wiwR‡Ki `wqZ Avjvni nv‡Z †bB| wZwb G‡`i eZgvb I fwel¨r wVKvbv meB Rv‡bb|

৩। "ওয়া ইন্নামিন শায়ইন ইল্লা ইন্দানা খাযাইনুহু ওয়ামা নুনায্‌যিলুহু ইল্লা বিকাদারিম মা'লুম ।" (২১-হুজরাত)

অর্থ ঃ *f-c‡ô Ggb †KD †bB hvi (wiwR‡Ki) LvRvbv/fvÊvi Avgvi Kv‡Q †bB| Avi Awg‡Zv G‡`i Rb¨ GK wbw`ó cwigv‡bB AeZxY K‡i _wK|*

এই আয়াত সমূহ দ্বারা আপনি অবহিত হয়ে গেছেন হয়ত,যে রিজিকের সকল ব্যবস্থাপনা ও সকল সমাধান মহান প্রভু বিশ্বপতি নিজ হাতেই রেখেছেন। তিনি কেবল মানুষের রিজিকের ব্যবস্থাই নন বরং ভু-পৃষ্টে বিচরণকারী সকল সৃষ্টিকূলের সকল প্রয়োজনাদী পূরণ করার চিন্তা ও দায়িত্বও তিনি নিজ হাতেই রেখেছেন। আর সেই সুবিধার্থেই উৎপাদন বৃদ্ধি ও হ্রাস করে থাকেন।

খুব চিন্তা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটা পরম করুণাময়ের কত বিরাট অনুকম্পা যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তিনি নিজ হাতে রেখেছেন। এই গুরুদ্বায়িত্বটা যদি মানুষের উপর চাপিয়ে দিতেন তাহলে এক বিরাট হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটে যেত। বেচারা মানুষের এই সীমিত জ্ঞান দ্বারা সারা পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকল সৃষ্টি জীবের খবরাখবর নেয়া কিভাবে সম্ভব হত,যে মানুষ প্রত্যেক সৃষ্টি জীবের যথাযথ রিজিক যার যার স্থানে পৌছাঁবে? আমাদের পিছনের আলোচনা দ্বারা আপনার খুব স্পস্ট হয়ে থাকবে যে মানুষ বেচারা একটু খানাপিনা বেশি হতে দেখলেই একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে, ভড়কে যায়। উৎপাদনের সেই সব সম্ভাব্য ক্ষেত্র গুলির সন্ধান না পেয়ে তার হুশ-জ্ঞান লোপ পায়। অথচ সর্বজান্তা,মহাজ্ঞানী,মহান স্রষ্টা এসকল ধন ভাণ্ডার সমূহকে জমিনের বুকে গচ্ছিত রেখে দিয়েছেন। যাইহোক,সৃষ্টি কর্তা যেহেতু প্রত্যেক প্রাণীর রিজিকের ব্যবস্থা সমষ্টিগত ভাবে নিজ জিম্মায় রেখেছেন,তখন এই ক্ষুদ্র,ক্ষীণকায় মানুষের হাতে এমন কি জাদুর কাঠি আছে যার তেলেস্মাতিতে সে সৃষ্টি কর্তার কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে আর এমন এক মহান গুরু দায়িত্ব সে মাথায় নিতে চায় যা পালন করার একমাত্র ক্ষমতা ও শক্তি কেবল আল্লাহ ছাড়া আর কারও হাতে নেই ?

GKUv f‡ji Aemvb t

যখন জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রবক্তাদের নিকট এই আয়াত ঃ “লাতাকতুলু আওলাদাকুম।”*(†Zvgiv †Zvgv‡`i mšvb‡`i nZ¨v K‡ivbv|)*

পড়া হয় তখন তারা 'সন্তান হত্যা' ও 'জন্মনিয়ন্ত্রণ' এর মাঝে পার্থক্য তুলে ধরেণ। আর বলেন যে,GB Avqv‡Z mšÍvb nZ¨v Ki‡Z wb‡la Kiv n‡q‡Q, Rb¥wbqšY Ki‡Z‡Zv wb‡la Kiv nqwb| GKUv Wvj fv½vi Aciv‡ai kw¯Í wn‡m‡e civ GKUv e¶ †K‡U †djvi Rwigvbv Av`vq Kiv †h‡Z cv‡iYv| অথচ এটা একটা মারাত্মক ভুল। পবিত্র কোরআন ঃ ÒjvZvKZj AvIjv`vKg|Ó এর উপর কথা সমাপ্ত করে নাই। সামনের বাক্যটাকে সংযুক্ত করে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় (পূর্নাঙ্গ বিষয় বস্তু) এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এখন সামনের বিষয়টাকে এড়িয়ে গিয়ে শুধু প্রথমাংশকে গ্রহণ করা ঐ প্রবাদের মতই হবে যেমনটা "লা তাক্‌রাবুস্‌সালাহ" এর মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফের এক জায়গায় বলেছেন "লা তাক্‌রাবুস্‌সালাহ" অর্থাৎ †Zvgiv bvgv‡Ri Kv‡Q I ‡hIYv hw` gvZvj Ae¯'vq _vK| এখন এ আয়াত থেকে একদল সুবিধাবাদী ভণ্ড লোক যারা নামাজের বিপক্ষে যুক্তি দেখায় তারা বলে যে দেখ আল্লাহই কোরআনে বলেছেন নামাজের কাছে না যেতে। সুতরাং নামাজ পড়ব কেন? কিন্তু কোন অবস্থায় আল্লাহ নামাজের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন সেটা আয়াতের পরের অংশে বলে দিয়েছেন। তবে তারা সামনের ঐ অংশটা না পড়ে শুধু আয়াতের প্রথমাংশ পড়েই ফতুয়া দিয়ে বসে যে নামাজের কাছেও যেওণা। ঠিক একই অবস্থা "লাতাকতুলু আওলাদাকুম" এই আয়াতের ক্ষেত্রেও। জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষের সেই সব সুবিধাবাদী লোকেরা আয়াতের প্রথমাংশ তেলওয়াত করে ফতুয়া দিয়ে বেড়ায় যে 'এখানে তো সন্তান হত্যার কথা নিষেধ করা হয়েছে, জন্মনিয়ন্ত্রণের কথাতো নিষেধ করা হয়নি' অথচ আল্লাহ তায়ালা আয়াতের শেষে বলেছেন "খাশ্‌য়াতা ইমলাক" `wi`Zvi f‡q এরপর সামনে গিয়ে এর কারণও উল্লেখ করেছেন যে,আমি (আল্লাহ) তাদের রিজিকের ব্যবস্থা করি এবং তোমাদের রিজিকের ব্যবস্থাও করি' এই কথাটা একটু ভাবলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে জন্মনিয়ন্ত্রণের যত পদ্ধতি দারিদ্রতার কারণে করা হয় এর একটাও জায়েজ হবে না। এই কথাটা আরও একটু বিস্তারিত জানতে হলে এই ভাবে একটু ভেবে দেখা যায় যে সন্তান হত্যা করা সর্বাবস্থায়ই নাজায়েজ। চাই দারিদ্রতার ভয়ে হোক অথবা অন্য কোন কারণে। সামনে

“খাশ্‌য়াতা ইমলাক” `wi`Zvi f‡q এবং “নাহনু নারযুকুহুম ওয়া ইয়্যাকুম” ,Awg Zv‡`i‡K (Av¸šK mšvb‡`i‡K) wiwRK w`‡q _wK Ges †Zvgv‡`i ‡KI| এর সংযোজন করার দ্বারা এই উদ্দেশ্য তো হতে পারেণা যে দারিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করা নাজায়েজ আর অন্য কারনে জায়েজ হবে। তাহলে এর উদ্দেশ্য কি? অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা কেন বললেন, ’দারিদ্রতার ভয়ের কথা’ ও আমি রিজিকের ব্যবস্থা করি’ ? আসল কথা হলো এই দু’টি বাক্য আয়াতের শেষাংশে বৃদ্ধি করে আল্লাহ তায়ালা অলৌকিক ভাবে সেসব বাতিল চিন্তা ধারার অপনোদন করেছেন যার ভিত্তিতে মানুষ বলে wiwR‡Ki mKj e¨e¯v AvgivB K‡i _wK। যা মূলত আল্লাহর কাজে হস্তক্ষেপ ও দখলদারিত্বের মত ধৃষ্টতার ইঙ্গিত বহন করে। আর তাই আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে এই ধারণাটাই সম্পূর্ণ ভুল যে জন্মহার বৃদ্ধি হওয়ার দ্বারা দারিদ্রতা বাড়ে ! সুতরাং জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ,চাই সন্তান হত্যার মাধ্যমে হোক অথবা জীবন নাশকের দ্বারা হোক, যদি দারিদ্রতার জন্য এমনটা করে থাকে তাহলে সর্বাবস্থায়ই তা নাজায়েজ হবে। এছাড়াও জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রবক্তাদের আরও একটি আজব ধরণের দলীল এই পেশ করে যে,রাসূল (সাঃ) অধিকাংশ সময় এই প্রার্থনা করতেন যে হে আল্লাহ ! আমি অমুক অমুক বিষয় হতে এবং ’জুহদুল বালা থেকে’ তোমার নিকট আশ্রয় চাই। সাহাবাগণ জানতে চাইল যে ইয়া রাসূলাল্লাহ এই জুহদুল বালাটা আবার কি? রাসূল (সাঃ) বললেন যে, এটা হলো “কিল্লাতুলমাল ওয়া কাসরাতুল ইয়াল” m¤ú‡`i míZv I cwiR‡bi AwaK¨Zv|

এই দলীলের উপর আমরা সর্ব প্রথম তো এই কথার উপর হতাশ এবং অবাক হই যে ’জুহদুল বালা’ এর যে ব্যাখ্যা নবী করীম (সাঃ) এর উদ্বৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে তা সঠিক নয়। কেননা হাদীস শাস্ত্রের সকল কিতাবাদি তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও কোথাও রাসূলে (সাঃ) কর্তৃক এ ধরনের কোন ব্যাখ্যার প্রমান মিলবেনা। বিখ্যাত হাদীস বিশারদগণ উক্ত হাদীস খানার যে ব্যাখ্যা প্রদান করেণ যা সাধারণত এই হাদীস খানা জয়ীফ তথা দুর্বল বলে প্রতিয়মান হয়। প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা আহমদ আলী লাহুরী (রাহঃ) এই ব্যাখ্যা প্রদান করেণ যে, ’জুহদুল বালা’ মানুষের

জীবনের ঐ সংকটময় মুহূর্ত যখন মানুষ জীবনের চেয়ে মৃত্যুকেই প্রাধান্য দিতে চায়। অথচ কিছু লোক এই ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করে যে,*mš¿vbv`x tewk n‡q hvIqv Avi m¤ú` Kg n‡q hvIqv*| 'জুহুদল বালা' এর এই অর্থ যদি সরাসরি রাসূল কর্তৃক হত যেমনটা এরা বলে থাকে তাহলে উলাময়ে কেরাম অন্য ব্যাখ্যা করতেন না এবং ঐ ব্যাখ্যাটাকে জয়ীফ/দুর্বল ও বলতেন না। কারণ রাসূলের (সাঃ) ব্যাখ্যা থাকতে এর বিপরীত অন্য ব্যাখ্যা দেয়ারতো প্রশ্নই উঠেনা। মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকারী আল্লামা নববী (রাহঃ) বলেন যে,'জুহদুল বালা' এর ব্যাখ্যায় একমাত্র ইবনে ওমর (রাঃ)ই একথা বলেন যে 'সম্পদের সল্পতা ও সন্তানাদীর ব্যাপকতা।' এছাড়া আর সকল সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ভাষ্য মতে 'জুহুদুল বালা' বলতে ঐ অবস্থাকে বুঝায় যা মানুষের জীবনকে অতান্ত কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয়। (মিনহাজ, শরহে মুসলিম ২য় খন্ড পৃ ৩৪৭)

একথার দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে এটা মাত্র ইবনে ওমরের ব্যাখ্যা। রাসূলের (সাঃ) ব্যাখ্য নয়। যদি রাসূলের ব্যাখ্যা হত তাহলে ইবনে ওমর সরাসরি রাসূলের উদ্বৃতি দিতেন না।

দ্বিতীয়ত ঃ তথাপিও যদি আমরা ঐ বিষয়টাকে মেনে নেই,(যেহেতু এটা ইবনে ওমরের মত) তাহলে সম্পদের সল্পতা ও পরিজনের আধিক্যতার কারণে যে জন্মনিয়ন্ত্রণ জায়েজ হয়ে যাবে তা কি করে হয়? এমন অনেক বিষয় আছে যে গুলি থেকে রাসূল (সাঃ) আল্লাহর নিকট আশ্রয় চেয়েছেন,অথচ অন্যত্র এই বিষয়টারই অনেক ফজিলত বর্ণনা করেছেন। যেমন রাসূল (সাঃ) প্রায়ই বার্ধক্য থেকে আল্লাহর পানাহ চাইতেন,আবার দেখা যায় এই বার্ধক্যেরণ অনেক ফজিলত বর্ণনা করেছেন। বাহ্যিকভাবে এ দুয়ের মাঝে বিরোধ দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবতা হল,বার্ধক্য সত্যিই এমন পানাহ চাওয়ার মত এক মহা বিপদ, যা আসার আগ পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারে না। কিন্তু যদি কেউ বার্ধক্যে উপনিত হয়ে যায় তাহলে সবর করলে সওয়াব হবে,যেমনটা অন্যান্য বিপদে সবর করলে সওয়াব হয়ে থাকে। বিপদে পড়ার আগে বিপদ থেকে কে পানাহ না চায়? কিন্তু বিপদে পড়ে গেলে আর ধৈর্য ধারণ করলে এই বিপদই সওয়াবের কারণ হয়ে দাড়ায়। এরচেয়েও সহজ উদাহারণ এটা হতে পারে যে,জ্বর একটি খারাপ

জিনিষ,কোন সুস্থ্য মানুষই কামনা করবেনা যে তার জ্বর হোক। কিন্তু যদি কেউ জরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন বিলাপ করা, হায়-হুতাস করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ও বিবেকের বিচারে কোন অবস্থাতেই জায়েজ নয়। কিন্তু যদি ভালভাবে ধৈর্য ধারণ করতে পারে তাহলে দুনিয়ার এই বিপদ দ্বীনি নেয়ামত হিসেবে পরিবর্তন হয়ে যাবে। এমনি ভাবে কোন দুর্ঘটনায় আহত হওয়া এক বিরাট বিপদ,কেউ কামনা করবেনা দুর্ঘটনায় পতিত হবে কিন্তু এ্যাকসিডেন্টের ভয়ে ঘর থেকে বের হওয়াই ছেড়ে দেওয়া নেহায়েত বোকামী ছাড়া আর কি? ঠিক তদ্রুপ এখানেও সল্প সম্পদে অধিক সন্ত ানাদী হওয়া ও একটি বিপদ, পরীক্ষার বিষয় ।যার থেকে পানা চাওয়া সবারই উচিৎ হবে। যদি কারও এমন পরিস্থিতি দেখা দেয় তাহলে এটাকে হাসি খুশিতে বরণ করে নেয়া উচিৎ। এই ক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রণ করে নাশুকরিয়া করা ও ধৈর্য হীনতার পরিচয় দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় কেননা রাসূল (সাঃ) বহু হাদীসে দারিদ্রতার ফজিলত বর্ণনা করেছেন।

৩) কেউ কেউ ফোকাহায়ে কেরামদের (ইসলামী আইন শাস্ত্রের পণ্ডিতদের) এই মূলনীতির ভিত্তিতে জন্মনিয়ন্ত্রকে বৈধ বলতে চান যে ফুকাহাগণ বলেছেন যে দুধ পানকারী শিশুর মাতা যদি আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা না পায়,মা নিজেই তার বাচ্চার দুধ পান করাতে হয় আর এ অবস্থায় অন্তঃস্বত্তা হলে বর্তমান বাচ্চার শারীরিক সমস্যা দেখা দিবে এই জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়েজ। এই দলীলের দ্বারাও জন্মনিয়ন্ত্রণের বৈধতার প্রমান হয়না, কেননা এই পার্সোনাল বিষয়াটির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যদি এই কারনে তার অন্তঃসত্বা হওয়ার পূর্বেই যদি কোন অসুস্থ্যতার দরুণ দুধ বন্ধ হয়ে যায়।

এমনি ভাবে নবজাতকের পিতার যদি তখন বর্তমান বাচ্চার দুধ পান করানোর জন্য দুধ মাতার পাওনা পরিশোধ করার মত সামর্থ না থাকার কারনে বর্তমান বাচ্চার প্রাণ নাশের সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে কেবল ঐ ব্যক্তির জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করার অনুমতি দেয়া যুক্তিযুক্ত এবং সেটা ঐ ব্যক্তি পর্যন্তই সীমিত থাকবে,এর সাথে তাল মিলিয়ে অন্যরাও (যাদের এমন কোন সমস্যা নেই) যদি এই সুবিধা নিতে চায় তাহলে সেটা জায়েজ হবে না। কিন্তু উপরোল্লিখিত মাসআলা (যার

দ্বারা কিছু লোক ব্যাপক ভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণকে জায়েজ বলতে চান) তা এর বিপরীত। সেখানে বর্তমান সন্তান মরে যাওয়ার বিষয়টি কল্পনা প্রসুত, একটাও বাস্তব নয়। কিছুলোক বসে বসে শুধু এই কল্পনা করছে,এই আশংকায় মাথা টাক করছে যে পৃথিবীতে বসতি যদি বেড়ে যায় তাহলে সবাই দরিদ্র হয়ে যাবে,অর্থসংকটে ভুগবে। এবার এসে এই লোকগুলি বিশ্ববাসিকে আহবান করে বলছে যে তোমরা যদি জন্মনিয়ন্ত্রণ না কর তাহলে তোমরাও দরিদ্র হয়ে যাবে,তোমাদের সন্তানরাও দরিদ্র হয়ে যাবে। অথচ পবিত্র কোরআন এসব কল্পনার ভীতিকে অবসান করত ঃ দ্ব্যার্থহীন ভাবে আহবান করছে যে, *Awg ‡Zvgv‡`i wiwR‡Ki e¨e¯'v I Kwi,†Zvgv‡`i mšvb‡`i wiwR‡Ki e¨e¯'v I Kwi| Ki‡Z _vK‡ev Ge¨vcv‡i †Zvgv‡`i wPšv Ki‡Z n‡ebv|*

Rb¥wbqš‡Yi c‡¶i hw³ I Zvi Ac‡bv`b t

জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রবক্তাদের সবচেয়ে বড় যুক্তি ও দলীল হলো যে,

১। ’বসতি দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে,এখনই যদি এর নিয়ন্ত্রণ করা না হয় তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্ম চরম অর্থ সংকটে পরে ধুকে ধুকে মরবে।’ তাদের এই দলীলের জবাব আমরা ইতিপূর্বে সব দিক থেকেই সবিস্তারে আলোচনা করে এসেছি। সম্মানিত পাঠক বৃন্দ অনুমান করেছেন যে এই যুক্তি কতখানি খোড়া ও বাস্তব বিবর্জিত। তাই আমরা এখন এই বিষয় নিয়ে পুনঃ আলোচনা করে সময় নষ্ট করতে চাইনা।

২। এছাড়া তাদের দ্বিতীয় দলীল হলো যে বসতি বেড়ে গেলে সৃষ্টিকর্তা তখন পরিস্থিতির ভারসাম্যতা বজায় রাখেন মৃত্যুর মাধ্যমে, আর এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক। সৃষ্টিকর্তাকে এমন মর্মান্তিক বিষয়ের মাধ্যমে ভারসাম্যতা রক্ষা করার চেয়ে মানব সন্তান জন্মের পূর্বেই এর প্রজনন উপাদান (রেণু) বিনাষ করে দিয়ে এর জন্মহার রোধ করে দেয়াটাই উত্তম। তাদের এই যুক্তি আমরা ঐ সময় পর্যন্ত মানতে পারতাম যদি জন্মনিয়ন্ত্রণ এর পদ্ধতি অবলম্বন করার দ্বারা জন্মহার নিয়ন্ত্রিত হওয়ার সাথে সাথে মৃত্যুর হারটাও কন্ট্রোল করা যেত। কিন্তু মৃত্যু তো প্রত্যেকের জন্যই অবধারিত বস্তু।

এবং এটা যখন যার উপর প্রয়োগ হবে তখন তার উপর প্রয়োগ হয়েই থাকবে। এর ব্যতিক্রম হওয়ার প্রশ্নই উঠেনা। তাহলে দেখাগেল মৃত্যু তার যথাযথ সময়ে প্রয়োগ হয়েই যাচ্ছে,আর ঐদিকে জন্মহার কমিয়ে রাখা হচ্ছে। এমতাবস্থায় তাদের এই যুক্তি ও কার্যক্রম কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে? কথাটা একটু অন্যভাবে বুঝতে গেলে উদাহারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে এই পৃথিবীটাকে যদি একটা বিশাল ধনভান্ডারের মত ধরা হয়,আর এর ব্যয় বা রপ্তানী প্রতিদিনই হচ্ছে বিপুলভাবে কিন্তু এর আমদানী এক পয়সা করেও হচ্ছে না। তাহলে এই ভাণ্ডার শুন্য হতে কয়দিন সময় লাগবে? ঠিক তেমনি ভাবে এই পৃথিবীর মানুষগুলিকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যাচ্ছেনা কিন্তু আবার নতুন কাউকে আসতেও দেয়া হচ্ছেনা,তাহলে এই পৃথিবী জনমানব শুণ্য হয়ে যেতে আর কয়দিন সময় লাগবে? বাকি কথা হলো সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাকে ক্ষতিকারক বলা হচ্ছে। কিন্তু মানব কর্তৃক যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সেটাকে খুব উপকারি ও যথার্ত বলা কতটুকু বাস্তব ভিত্তিক?

c_gZ t এই কথার কি প্রমাণ আপনার কাছে আছে,যে জনসংখ্যা বেড়ে গেলে সৃষ্টিকর্তা কেবল মৃত্যুর মাধ্যমেই এর নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য বজায় রাখবেন,মৃত্যু ছাড়া বিকল্প কোন সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তিনি কি অবলম্বন করতে পারবেন না? যদি না পারেণ তাহলে তিনি সর্বময় ক্ষমতাধর কি ভাবে হলেন? আর যদি তাঁর অগাধ ক্ষমতার উপর পূর্ণ আস্থা বিশ্বাস থাকেই তাহলে তার কাজের ব্যবস্থার উপর আমাদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজনটা কি? সৃষ্টিকর্তা এই কাজ নিজ দায়িত্বেই রেখেছেন। আর তিনি একাই বড় দক্ষতার সাথে নিপূন ভাবে তা আঞ্জাম দিবেন,আমাদের এনিয়ে ভাবনার কিছুই নেই। আর এসব ভাবতে যাওয়াও কেবল বাড়াবাড়ী, সীমালংঘন।

wØZxqZ t যদি (জন্ম ও মৃত্যু কম বেশি হওয়ার) এই দায়িত্ব আপনি নিজ হাতে নিয়ে নেন,তাহলে আপনার কাছে এই জনবসতির উপযোগী সীমানা নির্ধারণ করার কোন মাপকাঠি আছে কি? কথার কথা যদি থাকেও তাহলে সেই নির্ধারিত মাপকাঠি অনুযায়ী সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতা আপনার আছে কি? যুক্তি খাটানোর প্রয়োজন নেই। বাস্তব অভিজ্ঞতা বলছে যে যাদেরকে

'উন্নত জাতি' বলা হয়,বিজ্ঞান তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারেও যারা আপনাদের তুলনায় জুযন জুযন অগ্রগামী। তারাও এ ধরনের উপযোগী সীমানা নির্ধারণ করতে সক্ষম হয় নাই। জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলাফলের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে যখন মনগড়া চিন্তা ভাবনা শুরু হয়ে যায় তখন জনসংখ্যাকে একটা সীমিত আকারে হ্রাস করার চিন্তাই করতে পারেণা। (কারণ তারা চায় একেবারেই জন্মহার বন্ধ করে দিতে) ১৬৫৬ ইং সনে চায়নারা খুব ব্যাপক উদ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ও উপকারিতা জনসাধারনের মধ্যে প্রচার করতে লাগল। কিন্তু ১৯৫৮ সন পর্যন্ত যখন এর ভয়াবহ ক্ষতি গুলি প্রত্যক্ষ করতে লাগল,তখন সরকারও ধর্মীয় উপাসনালয় গুলিতে সম্মিলিত ভাবে এই নির্দেশ জারি করতে লাগল যে এখন থেকে আর কেউ জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবে না। যে যত পার সন্ত ান জন্ম দাও। 'অধিক জনসংখ্যা অধিক সুখের সোপান।' কার্লমার্কসের এই নীতি অনুসারে সবাই জনসংখ্যা বাড়াও। এরপর যখন জনসাধারণের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে প্রচারণা শুরু হয়ে গেল তখন জনসাধারনের মধ্যে এর কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। এমন কি খৃষ্টানদের প্রোটষ্টেন্ট (গ্রুপ) সম্প্রদায় যারা জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রবক্তা ছিল তারাও সরকার বিরোধী (তথা জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে) প্রচারণা শুরু করে দিল। তাই সরকার এতে আশানুরূপ ফলাফল পেল না বিধায় এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সেনা অভিযানের ব্যবস্থা নিল,এরপরও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যথাযথ সফলকাম হতে পারলনা। (সাপ্তাহিক টাইমস্ ১১/১/৬০ ইং)

৩। এদের ৩য় যুক্তি : সীমিত আয়ের পিতামাতা তাদের সন্তানদের জন্য উন্নত শিক্ষা-দীক্ষা,মনোরম জীবন যাপন,সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে সক্ষম হয়না। তাই বাহ্যিক ও অভ্যন্তরিণ ভাবে হতাশাগ্রস্থ লোকদের ভীড় বাড়ার পূর্বে উত্তম ব্যবস্থাতো এটাই হতে পারে যে জনসংখ্যা কম হওয়া এবং উন্নত শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে সুন্দর জীবন-যাপন করা। তাদের এই মনভোলানো যুক্তিতে অনেকেই ঝুকে পড়তে দেখা যায়। কিন্তু! গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে এটাও পূর্বের যুক্তি গুলির মত টিকেনা। প্রথমত : সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দের জীবন যাপন এই কথাটাই একটা আনুমানিক সন্দেহ যুক্ত কথা। এই স্বাচ্ছন্দের জীবন বলতে এর নিজস্ব কোন সীমারেখা নাই।

প্রত্যেকেই যার যার চিন্তা চেতনায় এর নিজস্ব অর্থ বুঝে থাকে,নিজে যে অবস্থায়ই থাকুক এর চেয়ে ভাল যে আছে তার মত হতে অথবা তার চেয়েও ভাল চলতে পারাকে স্বাচ্ছন্দের জীবন মনে করে থাকে । তাই যে ব্যক্তি স্বাচ্ছন্দের জীবনের প্রত্যাশী,সে নিশ্চয় এই সিদ্ধান্ত নিবে যে তার একটা কি দু' টার অধিক সন্তান না হোক । বরং কখনো বিশেষ প্রেক্ষাপটে কোন সন্তানই না থাকুক এমনটাই সে চাইবে । বর্তমান বিশ্বে এমন লক্ষ লক্ষ দম্পতি পাওয়া যাবে যারা শুধু এই কারণে সন্তান নিচ্ছেনা যে সন্তানের লালন পালন,উন্নত শিক্ষা দীক্ষা,উন্নত জীবন যাপন,উজ্জল ভবিষ্যৎ গড়তে যে পরিমান আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রয়োজন তা এখনও তার অর্জিত হয়নি তাই তারা এখনো সন্তান নিচ্ছে না । সন্তান জন্ম দেয়ার মূল ভিত্তি যখন এমন চিন্তাধারা হবে,তখন কে একথা ভাববে যে এই দেশ ও জাতির কি পরিমান লোক সংখ্যার প্রয়োজন? এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করতে প্রতিটি সেক্টরে আরও কি পরিমান লোকের প্রয়োজন ।

দ্বিতীয়ত: তাদের এই যুক্তি মৌলিক ভাবেও চরম ভুল । কারণ যে জাতি কেবল স্বাচ্ছন্দ সুখ আরামের প্রত্যাশী,তারা অলস জাতি,তাদের উজ্জল ভবিষ্যৎ গড়ে উঠা আদৌ সম্ভব নয় । সেই জাতি কয়দিন বাঁচতে পারবে যারা কেবল আরাম, সুখ বিলাসিতা খুজে, একটু কষ্টও করতে চায়না ? একটি দেশ ও জাতিকে উন্নত করতে হলে হাজার দিক থেকে কষ্ট করতে হয়,মসিবত সহ্য করতে হয় । দেশের প্রতিটা নাগরিক ও জাতির প্রত্যেকটা সদস্য যদি দেশের উন্নয়নের কষ্ট সহ্য করতে সেচ্চায় এগিয়ে না আসে তাহলে মনে রাখতে হবে এই জাতির পতনের দিনক্ষণ ঘনিয়ে আসছে ।

Av‡iKwU hw³ t

এই যুক্তির পাশাপাশি তারা আরেকটি যুক্তি পেশ করে থাকে,আর তাহলো এই যে,জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করার মাধ্যমে ভাল বংশ ও উন্নত প্রজন্ম উপহার দেয়া সম্ভব । যারা সুস্বাস্থের অধিকারী হবে এবং শক্তিশালী ও কর্মদক্ষ হবে । কিন্তু এই চিন্তার ভিত্তি ঐ অনুমানের উপর যে,যার মাত্র একটা অথবা দুইটা বাচ্চা থাকবে এই বাচ্চাগুলি অসাধারণ মেধাবী,সুস্থ্য ও

সবল হবে। আর যদি অধিক সন্তান হয়ে যায় তখন সবগুলি বাচ্চাই বোকা,নির্বোধ,দূর্বল,অসুস্থ্য ও অকেজো হবে। কিন্তু! তথাকথিত এই স্বীকৃতির পক্ষে কি কোন যুক্তি অথবা বাস্তব অভিজ্ঞতার কোন প্রমাণ কেউ পেশ করতে পারবে? এই বিষয়টাতো সম্পূর্ণ আলাহ রাব্বুল আলামীন এর হাতে রয়েছে। আল্লাহ বলেন:- "তিনি সেই মহা ক্ষমতাধর সত্তা যিনি তোমাদেরকে মায়ের পেটের ভিতরে যেমন খুশি তেমন করেণ সৃষ্টি করেই।"

5g hw³ t

কেউ কেউ বলেন অধিক সন্তান প্রসব করার দ্বারা মহিলারা দূর্বল,ক্ষীণকায় হয়ে যায়,তার সৌন্দর্যের ভাটা পড়ে,লাবণ্যতা হ্রাস পায় সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের এই যুক্তি গ্রহণ যোগ্য নয়।

প্রথমত : এই জন্য যে আমরা প্রথমেই বলে এসেছি যে মহিলাদের শারীরিক অবকাঠামোতে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করার দ্বারা মারাত্বক প্রভাব পড়ে। অধিক সন্তান নেয়ার তুলনায় জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষতি জুযন জুযন বেশি ।

দ্বিতীয়ত : আপনারা পিছনে শরয়ী বিধান এর অধ্যায়ে পড়ে এসেছেন যে মহিলা যদি সন্তান প্রসবের দ্বারা অসুস্থ হয়ে যায় অথবা কোন মহিলা যদি প্রসব কালীন কষ্ট সহ্য করতে সক্ষম না হয়,একেবারে অপারগ হয়ে যায় তাহলে তার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়েজ আছে। কিন্তু এই ব্যক্তিগত অপারগতার বিষয়,আর সামগ্রীক ভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রচলন করার বিষয় দুইটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। উপরোল্লিখিত বিষয়ে কারও ব্যক্তিগত সমস্যার কারনে ব্যক্তি কেন্দ্রিক জন্মনিয়ন্ত্রণের অনুমতি রয়েছে। আর বর্তমান জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের প্রচলন গোটা দেশ ও জাতি ব্যাপী। সামগ্রীক ভাবে এর প্রচার প্রসার ঘটানো হচ্ছে। তাই এই দুইটা বিষয় একহতে পারেণা কিছুতেই।

`vi“YveKí e¨e¯v t

জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রবক্তাদের কাছে যখন বলা হয় যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা মানে, সারাসরি সৃষ্টি কর্তার কাজে হস্তক্ষেপ করা। আর আল্লাহ তায়ালা সকল প্রাণী কুলের জীবিকা নির্বাহের জন্য যথেষ্ট। তখন তারা এই কথা বলে থাকে যে, ‘আল্লাহর উপর ভরসা করার অর্থ এই নয় যে সকল উপায়,অবলম্বন পরিত্যাগ করে খালি বসে বসে কেবল আল্লাহ আল্লাহ করা। আমরা জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কে একটা উপায় হিসেবেই বেছে নিয়েছি।’

ঠিক আছে! আমরাও একথা মানি যে তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর উপর ভরসা করার মানে সকল মাধ্যম পরিত্যাগ করা নয়। কোন উপায় অবলম্বন করে তবেই আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিৎ। কিন্তু, তাওয়াক্কুল মানে কি এমন উপায় বা মাধ্যম অবলম্বন করা,যা শরীয়ত পরিপন্থি ? অযৌক্তিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ও বিপরীত ? মনে করুন,আপনি একটা ছোট্ট ঘর বানিয়েছেন ঘরটা এত নিচু যে আপনি এর ভিতর গিয়ে সোজা হয়ে দাড়ালে মাথা ঘরের চালে (ছাদে) ঠেকে! এমতাবস্থায় আপনি ঘরের ভিতর সোজা হয়ে দাড়ানোর সুবিধার্থে আপনার পা দু’টা কেটে ফেলে দেয়া বুদ্ধি মানের কাজ হবে কি? না কি ঘরের চালটা আরও উঁচা করা?

আমরা এখানে এমন কয়েকটি বিষয় আলোচনা করতে চাই যা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সুন্দর বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত। এবং এই ব্যাখ্যার কার্যকরি চিকিৎসা হতে পারে যা জন্মনিয়ন্ত্রণের নামে আত্মপ্রকাশ করছে।

K) Rxeb hvc‡bi eZgvb avivi ms‡kvab Ki‡Z n‡e t

সর্ব প্রথমবিষয় হলো আমরা যদি আমাদের জীবন ধারাকে ইসলামী ধাঁচে গড়ে তুলি তাহলে (আমাদের) জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন পড়বেনা। কিন্তু আমার এই মতের সাথে অনেক দূরদর্শি বুদ্ধিজীবিই হয়ত একমত পোষণ করবেনা,তারা আমাকে ঐ কবির মত মনে করবে যে বলে:

“মগছ কু-বাগমে জানে না দেনা,
কে নাহক্ক খুন পারওয়ানেকা হোগা ।”
মৌমাছিকে যেতে দিওণা তোমরা ফুল কাননে,
এই ক্ষুদ্র পোকা তার জীবনই বিলিয়ে দিবে অকারনে ।”

এই দূর্রদর্শি লোকেরা যদি আরও বিচক্ষণতার সাথে বিষয়টা ভাবে তাহলে তাদের কাছে তা সূর্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে । প্রথমে সে সকল কারণ সমূহের দিকে একটু ফিরে দেখা হোক,যেসব কারনের ভিত্তিতে পশ্চাত্যের লোকেরা জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হয়েছিল ।

1. c_g KviY : যখন আমেরিকা মহাদেশের আবিস্কার হলো, আর ভাস্কো দ্যা গামা ভারত বর্ষে আগমনের ঐ রাস্তা অবলম্বন করল যা আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত হয়ে অতিক্রম করছে । ততদিনে ইউরোপিয়ানরা ব্যবসা বানিজ্যে অনেক উন্নত হয়ে গিয়ে ছিল । তাদের একটা বিরাট দল (কাফেলা) ব্যবসা বানিজ্যে মনোনিবেশ করল । জনসাধারণের মাঝে চাষাবাদের পরিবর্তে ব্যবসা বানিজ্যের প্রচণ্ড আগ্রহ লক্ষ করা গেল । যার ফলে শিল্প কারখানার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হল । বিশাল বিশাল শিল্প কারখানা গড়ে উঠল,আর যখনই নতুন কোন বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হত । তখন হাজার হাজার শ্রমিকের প্রয়োজন দেখা দিত । এদিকে গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য লোক জমিদারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল । তাই গ্রামের লোকেরা (অধিবাসিরা) শিল্প কারখানায় চাকুরী পাওয়াটাকে এক বিরাট সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করে গ্রাম ছেড়ে শহরের বাসীন্দা হতে লাগল । এই সকল পরিবর্তনের ফলাফল এই দাড়াল যে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেল,আর তার স্থান দখল করে নিল শিল্প কারখানা । এরপর কারিগরি শিল্পের প্রতি আগ্রহ বাড়ার কারণে অনেক মেশিন আবিষ্কার হলো, এভাবেই শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়ে গেল ।

2. এই শিল্প বিপ্লেবের ফলে প্রথম দিকে তো ইউরোপবাসীদের জনজীবন অত্যন্ত জৌলুশ পূর্ণ দেখা দিল, কিন্তু এর পরিণতিতে কিছু দিন পরই তাদের জীবন যাপনে অসংখ্য সংকট দেখা দিতে লাগল। পার্থিব জীবনের মাপ কাঠি অনেক উঁচু হয়ে গেল,প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যাপকভাবে বেড়ে গেল। আর দ্রব্যমূল্য এত বৃদ্ধি পেল যে,সীমিত আয়ের লোকদের জন্য বর্তমান বাজার দর অনুসারে স্বাচ্ছন্দে চলাতো দূরের কথা,কোন রকম জীবনটা বাঁচিয়ে রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়াল। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রত্যেকেই এই চিন্তা করতে লাগল যে কিভাবে নিজের এই সীমিত আয় কেবল নিজের ব্যক্তিগত কাজেই ব্যয় করা হবে? অন্য কোন শরীক বা অংশীদার যেন তার এই সীমিত আয়ে ভাগ বসাতে না পারে। তাই বংশ বা সন্তানাদী সীমিত করার বা যতটুকু সম্ভব কমিয়ে রাখার চিন্তা ভাবনা মাথায় ঢুকল।

3. জীবন ব্যবস্থার এই ধারায় মহিলারাও বাধ্য হলো চিরাচরিত সেই প্রথা ভেঙ্গে দিতে,যে পুরুষরা শুধু কামাই উপার্জন করবে আর নারীরা ঘরের অভ্যান্তরীন ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত থাকবে! তাই নারীরাও সম্পদ অর্জনের জন্য ময়দানে বেরিয়ে পড়ল। এর ফলে একটা বিরাট ক্ষতিতো এই দেখা দিল যে তাদের পক্ষে সন্তানদের লালন পালন করা খুব কঠিন হয়ে গেল। আর দ্বিতীয় ক্ষতিটা হলো: যখন ঘর থেকে বের হওয়ার স্বাধীনতা তারা পেয়ে গেল আর পুরুষেদের সাথে অবাধ মেলা মেশার সুযোগও পেয়ে গেল,তখন তাদের মধ্যে এক অদ্ভুত মানষিকতা গড়ে উঠল। যার দরুণতাদের মধ্যে পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সব কাজ করার আগ্রহ তৈরি হলো। ঘরের সেবা করা,সন্তানের লালন-পালন যা তাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল,এর থেকে তারা অনিহা প্রকাশ করতে লাগল,অমনোযোগী হতে লাগল। এসব কারণে তাদের মানষিকতা গড়ে উঠল যে,যেভাবেই হোক সন্তানদির

ঝামেলা,বাচ্চা-কাচ্চার জঞ্জাল থেকে মুক্ত থাকতে পারলেই ভাল,বরং বাঁচা গেল ।

4. যখন ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যতার ছড়াছড়ি দেখা দিল,তখন ধনকুবের আমীর শ্রেণীর লোকেরা তাদের মনোবল পূরণ করতে এবং ভোগ বিলাশিতার জন্য এমন এমন পদ্ধতি আবিস্কার করল,যা অত্যাধুনিক হওয়ার পাশাপাশি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের জন্য দূর্মূল্য ছিল । এদের দেখাদেখি মধ্যবিত্ত,নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা সেই উচ্চ মূল্যের দ্রব্যাদী ব্যবহার করতে আরম্ভ করে দিল । যার ফলে লোকদের অনেক বিলাশী সামগ্রীও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী হয়ে গেল । ফলশ্রুতিতে জীবন যাত্রার মাত্রা এত উচ্চ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাল যে,একজন মধ্যবিত্ত লোকের স্বস্ত্রীক পেট পালাই কঠিন হয়ে দাড়াল । খাদ্য-দ্রব্যে আরও অধিক ব্যয় করারতো প্রশ্নই উঠেনা ।

5. নাস্তিকতা,বস্তুবাদী লোকেরা তাদের অন্তর থেকে আল্লাহর অস্তিত্বের বিশ্বাসটা দূর করে দিয়েছে । তাদের বিশ্বাস যে, ‘তাদের রিজিকদাতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ আছেন,যিনি তাদেরকে এমন দূর দূরান্ত থেকে ও গোপন স্থান থেকে রিজিক দান করেণ যা সাধারণ জ্ঞানের বাইরে ।’

এগুলি ছিল ঐ সব কারণ সমূহের আলোচনা যেই কারণের ভিত্তিতেই ইউরোপের লোকেরা জন্মনিয়ন্ত্রণ করাকে জরুরী মনে করেছিল । এই কারণ গুলি অধ্যায়ন করলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে তারা শুরুতেই একটা মারাত্মক ভুল করে বসেছে যে তারা তাদের জীবন-যাপনের ধারাকে ঐশ্বর্য, ভোগ-বিলাশিতা ও বস্তুবাদিতার অন্তঃসার শুন্য ভিত্তির উপর নির্মাণ করেছে । এরপর যখন বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে তখন তারা ২য় আরেক মারাত্মক ভুলের সম্মুখিন হয়েছে যে,জীবন

যাত্রার এই বিলাশিতা বহাল রেখেই বসতি (জনসংখ্যা) হ্রাস করতে আরম্ভ করল ।
এই দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা আপনি হয়ত অবহিত হয়ে থাকবেন যে জনসংখ্যা হ্রাস করা কোন স্বভাবজাত পন্থা নয় । বরং কিছু জরুরী পরিস্থিতির সম্মুখিন হয়ে পাশ্চাত্য সমাজে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচলন হয়েছিল । এই কারনেই যখন প্রথম প্রথম ১৭৫৮ সনে ম্যালথাস এই মতবাদ আবিস্কার করেছিল তখন পশ্চিমা জগত এব্যাপারে কোন আগ্রহণ দেখায়নি । এরপর ১৮৭৬ সনে দ্বিতীয় বার পূনরায় এই আন্দোলোন জাগ্রত হল এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রচলন করতে লাগল ।
দ্বিতীয়ত: আপনি পিছনে এদের অবস্থা পড়ে এসেছেন যে,জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে সেসব দেশে কি কি ভয়াবহ ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে? এটা যদি কোন স্বভাবজাত পন্থাহত তাহলে ভাল ফলাফলই প্রকাশ পেত । তাই যদি কখনো এমন পরিস্থিতি দেখা দেয় যার ভিত্তিতে এই অস্বাভাবিক পদ্ধতির উপর আমল করা আবশ্যক হত তাহলে প্রজনন ও বংশ বিস্তারের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া উন্নয়নশীল হতনা । বরং সেই সকল অবস্থা বদলে ফেলা উচিৎ যা একটি অস্বাভাবিক পন্থার দিকে নিয়ে যাচ্ছে ।

Bmjv‡gi Rxeb hvcb bxwZ t

ইসলামের চিরন্তন বিধানের উপর যদি যথাযথভাবে আমল করা হয় তাহলে সেসব প্রেক্ষাপটই সৃষ্টি হবেনা যার দরুণ মানুষ জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে । ইসলাম পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত পুঁজিবাদের গোড়া কর্তণ করে দিয়েছে । সুদকে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছে । মাল (সিন্ডিকেটের মাধ্যমে) গোদামজাত করে রাখার প্রক্রিয়াকে ঘৃণ্যতম অপরাধ বলেছে । জুয়াকে প্রতিহত করেছে । যাকাত,উশর,খিরাজ এবং উত্তরাধিকার এর বিধান জারি করেছে । এসকল সুন্দর ব্যবস্থাপনা জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাকে রহিত করে দেয় । পাশ্চাত্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের আরেকটি পরিকল্পনা ছিল মহিলাদেরকে ঘর থেকে বের করা । ইসলামে নারীকে উত্তরাধিকারী এবং স্বামীকে তার যাবতীয় ভরণ-পোষণের দায়িত্ব

দিয়ে নারীর মানষিকতা থেকে এই চিন্তা দূরকরে দিয়েছে যে, তাকে উপার্জনের জন্য ঘর থেকে বের হতে হবে! এদিকে নারী পুরুষের অবাধ মিলামেশার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত পর্দার বিধান জারি করেছে। এবং সে সব কারনের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে,যে কারণে নারীরা সন্ত ানাদী লালন পালনের ঝামেলা থেকে এবং ঘরোয়া কাজ থেকে অনিহা প্রকাশ করতঃ দুরে থাকতে পছন্দ করত। ইসলামের চারিত্রিক প্রশিক্ষণ মানুষকে সাদাসিধা জীবন যাপন ধার করতে উৎসাহিত করে। এবং এই পদ্ধতিটা অর্থনৈতিক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে খুবই উপকারী। ইসলাম মদপান,ব্যাভিচার,অশ্লিলতা এবং বেহায়াপনাকে হারাম ও অবৈধ ঘোষণা করেছে। এবং এমন অনেক অযথা ঘুরাফেরাকেও নিষেধ করে যা কেবল সৌখিনতা,বিলাশিতার দরুণ হয়ে থাকে। অতঃপর ইসলাম অন্যান্য মানুষের সাথে দয়া,সহমর্মিতা,ভ্রাতৃত্যবোধ শিক্ষা দেয়। অসহায় অনাথ দুস্থদের সহায়তায় এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামে এও শিক্ষা দেয় যে প্রতিবেশির অধিকার কি হবে আর আত্মীয় স্বজনদের অধিকারও কি হবে। এই সকল বিধানাবলীর দ্বারা ইসলাম,নফসের গোলামী,বিলাশ প্রিয়তা ও মনগড়া ধংসাত্বক কার্যক্রম থেকে বিরত রাখে। যারা পাশ্চাত্য সভ্যতায় জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে লোকদেরকে উৎসাহীত করছিল এমনকি বাধ্যও করছিল। সবচেয়ে বড় কথা ইসলাম সেই খোদার স্মরণ করিয়েছে মানুষকে,যিনি সকল সৃষ্টির (খালেক) সৃষ্টিকর্তা ও রিজিক দাতা,যে খোদা হতে বিচ্ছিন্ন মানুষ কেবল নিজের চেষ্টার উপর ভরসা করতে থাকে। ইসলাম এসে সেই সব লোকদেরকে আহবান করছে যে তোমাদের মালিক একজন আছেন যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন,তিনি তোমাদেরকে অজ্ঞাত সারেই সৃষ্টি করে ফেলেন নি বরং তিনি ভালভাবেই জানেন যে,তোমরা কোথায় জীবন যাপন করো ও কি খাও? তার কাছেই একদিন ফিরে যেতে হবে।

মোটকথা ইসলাম এসব প্রজ্ঞাপূর্ণ মূলনীতির মাধ্যমে সে সকল ছিদ্রপথ বন্ধ করে দিয়েছে,যার দ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। এবং সে সব কারণ সমূহের বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। যার কারণেই পাশ্চাত্য সমাজ জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে এগিয়ে ছিল। এই সব বিষয়াদী পর্যালোচনা করত:

আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেণ,যদি ইসলামের চিরন্তন বিধান সমূহের উপর শতভাগ আমল করা হয় তাহলে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করার আর কোন প্রয়োজন থাকে কি?

Drcv`b ew× Kiv t

আপনাদের তা জানা আছে যে,আয়তনের তুলনায় পাকিস্তানের (বাংলাদেশসহ) জনসংখ্যা বেশি নয়। বরং তা বর্তমান উৎপাদিত ফসলের তুলনায় যথেষ্ট। জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেলে এই ফসল তখন যথেষ্ট হতোনা,সংকট দেখা দিত। এই জন্য আমাদের এখন করণীয় হল যথাসম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধি করা। যা করার যথেষ্ট সুযোগ এই দেশে রয়েছে। সর্বপ্রথম এই চেষ্টা করতে হবে,যে পরিমান আয়তন আমাদের আছে,তার মধ্যে বেশি করে চাষাবাদ করা এবং এই ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা,যাতে অল্প জমিতে অধিক পরিমানে চাষ বা ফসল ফলানো সম্ভব হয়। এদিক থেকে আমরা জাপান ও হল্যান্ডকে মডেল হিসেবে নিতে পারি। তারা আয়তনের দিক থেকে পাকিস্তানের চেয়ে ছোট হওয়া সত্যেও কিভাবে পাকিস্তানের তুলনায় ফসল তিন থেকে চারগুন বেশি ফলাতে সক্ষম হয়! কারণ একটাই,আর তাহলো তারা তাদের জমিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে থাকে। এরপর প্রয়োজন মোতাবেক অনাবাদী পরিত্যাক্ত জমিগুলিকে চাষাবাদের কাজে লাগানো হবে। গোটা পাকিস্তানে (বাংলাদেশসহ) এমন অনাবাদী পরিত্যাক্ত জমিনের পরিমান হলো বিয়াল্লিশ কোটি তেষট্টি লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার একর জমি। যার অধিকাংশ জমি কৃষি বা চাষাবাদের উপযোগী। মাত্র ছয় কোটি আটাইশ লক্ষ সাত হাজার একর জমিতে চাষাবাদ হচ্ছে। তাহলে বুঝা গেল যে সর্বমোট ভূখণ্ডের মাত্র ২৫ শতাংশ জমিও এখন চাষাবাদের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছেনা। অনাবাদী জমিগুলি আবাদ করে প্রচুর পরিমানে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। পাকিস্তানের কৃষি বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদদের অভিমতও এটাই যে আমরা যদি আমাদের অনাবাদী জমিগুলিকে যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে চাষাবাদের আওতায় এনে প্রচুর পরিমানে ফসল উৎপাদন করতে পারি

তাহলে জনসংখ্যা বাড়লেও সেই বর্ধিত জনসংখ্যার যাবতীয় প্রয়োজনাদীর চাহিদা মেটাতে যথেষ্ঠ হবে ।

Drcvw`Z dm‡ji h_vh_ msi¶Y t

ফসল উৎপাদনের সাথে সাথে একথাও ভালভাবে খেয়াল রাখতে হবে,যে পরিমান পন্য ও খাদ্যশষ্য উৎপাদিত হয় সেটা নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে হেফাজত করা । বাহ্যত এটা একটা সাধারণ কথা মনে হয় । কিন্তু গভীর দৃষ্টি দিলে এবং বিচক্ষণতার সাথে চিন্তা করলে এটা একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । যে কোন সম্পদকে অযথাই ফেলে রাখা অথবা এর ভূল ব্যবহার করা,গুদামজাতকরণ,পুঁজিবাদ,স্মাগলিং ও জুয়া ইত্যাদি সব কিছুই সম্পদ অপচয় ও নষ্ট করে দেয়ার শামিল । এর প্রত্যেকটাকে যদি আপনি আলাদা আলাদা করে বিশ্লেষণ করেণ তাহলে বুঝে আসবে আমরা এতে লিপ্ত হয়ে কি মারাত্মক ভূল করছি ।

1. এমন অনেক জিনিস আছে যার থেকে আমরা সঠিক কাজটা নেই না । আর এভাবেই অবহেলায় ফেলে রাখি । যেমন পাকিস্তানের মরদান এলাকায় এত বিরাট একটা চিনির মিল আছে যা এশিয়ার সর্ব বৃহৎ । কিন্তু সেখানে গেন্ডারি থেকে রস বের করে আবরণগুলি এমনিতেই ফেলে দেয়া হয় । অথচ এটা খুব উপকারী একটা বস্তু । কানাডার মত দেশে এই আখের রশ বের করে এর অবশিষ্ট আবরণ দিয়েই কাগজ বানানো হয় । এবং এর চেয়ে বড় বিষয় হলো মিলের ভিতরে আখের যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রাংশ লেগে থাকে তা বের করে এনে তা দ্বারা ঔষধ বানানো হয় । আমরা যদি পাশ্চাত্য দেশ সমূহ থেকে এই সব নতুন ক্ষতিকারক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ না করে এই জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডার শিখি বা গ্রহণ করি তাহলে আমার মতে আমাদের মানমর্যাদা ও আত্মসম্মানের কোন ক্ষতি বা ঘাটতি হবে বলে আমি মনে করি না । আরেকটি উদাহরণ শুনুন! আমাদের দেশে ফসল কাটার সময় শীষের সাথে সাথে এর জড় সহ উপরে ফেলা হয় বা কেটে আনা হয় । আর

এর ব্যবহার করা হয় পশুর খাদ্য হিসেবে অথচ এই জড় উঠিয়ে নিয়ে আসার দ্বারা মাটির উর্বরতা কমে যায়, অন্যান্য উন্নত দেশ সমূহে ফসলের এই জড় সমূহ মাটিতেই রেখে আসা হয় যার ফলে জমিন আরও উর্বর ও শক্তিশালী হয়।

2. এছাড়া আরও অনেক জিনিস আছে যার ভুল ব্যবহার করার দ্বারা আমরা অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেই। আরও একটা উদাহরণ এই দেয়া যায় তাহলো: আমাদের দেশের মোট চাষাবাদের জমিন প্রায় ছয়কোটি আটাইশ লক্ষ একর,যা কৃষি অধিদপ্তরের রিপোর্ট থেকে প্রকাশ পেয়েছে। তার মধ্যে একলক্ষ চুয়ান্ন হাজার সাতশত আটচলিশ একর জমিতে শুধু তামাক চাষ করা হয় যা হতে ২০ কোটি ২৩ লক্ষ ৭ হাজার ৩০০ পাউন্ড তামাক উৎপাদিত হয়। যে দেশের জনগণ ক্ষুধা, দারিদ্রতা,অধিক জনসংখ্যা ও অল্পআয়ের দরুণ জীবন সংকটাপন্য হওয়ার চিৎকার,হাঙ্গামা জুড়ে সোরে করছে। সেই দেশে প্রায় সোয়া দুই লক্ষ একর জমিতে কেবল তামাক চাষ করা, যা মানুষের শারীরিক মারাত্মক ক্ষতিকারক হিসেবে প্রমানিত,এটা কি অন্যায় নয়? ক্ষুধার্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির সাথে এটা কি এক ধরনের উপহাস নয়? এমন ক্ষতিকারক বস্তুর চাষ সম্পুর্ণ রূপে বন্ধ করা,অন্ততপক্ষে চাষাবাদের পরিমান হ্রাস করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

3. স্টক ব্যবসায়ী, (সিন্ডিকেটের মাধ্যমে) স্মাগলাররা রাষ্ট্রের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ব্যহত করতঃ যে অপূরণীয় ক্ষতি করে থাকে তা দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যায়। তবে একথাও সত্য যে রাষ্ট্রের পক্ষে এসব মাফিয়াদের একেবারে নির্মূল করাও সম্ভব নয়। তবে আমরা যদি দেশকে ভালবাসি,দেশের উন্নয়ন করতে চাই এবং যে পরিমান শারিরীক,আর্থিক চেষ্টা জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে করে থাকি। এতটুকু চেষ্টা সাধনা যদি নিখূতভাবে এগুলো দমন করতে ব্যয় করি, তাহলে ব্যাপক গণসচেতনতা এদের বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে পারি তাহলে এই বদমাইশ,গাদ্দারগুলি দেশ জাতি ও রাষ্ট্রের এত মারাত্মক ক্ষতি

করার মত সৎ সাহসের (!) সুযোগ পাবেনা । হতে পারে আমার এই চিন্তাধারার সাথে কোন কোন বুদ্ধিজীবি একমত হতে পারবে না এবং এই আলোচনাকে অহেতুক ভাববেন । কিন্তু বাস্তবতাহলো এই সব মারাত্নক ভুল সমূহের কারণে যে সব নিয়ামত হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে সেটা তো আছেই,এর কারনে আরেকটি মহাক্ষতি এও হচ্ছে যে অন্যান্য যেসকল জীবন উপকরণ রয়েছে তাতেও বে-বর্কতী হয়ে যাচ্ছে । এবং যে পরিমান সম্পদ হলেই আমাদের যথেষ্ট হয়ে যেত তা এখন আর হচ্ছেনা ।

4. m¤ú‡`i môe›Ub t

চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জমিন ও জমিনের উৎপাদিত ফসল সহ যাবতীয় সম্পদ তাদের হক্বদারের নিকট যথাযথ সুষ্ঠু ও ন্যায় নীতির মাধ্যমে বন্টন করা । এমন যেন না হয় যে,সবল দূর্বলের সম্পদ গ্রাস করে নিয়েছে । যদি বন্টন করার ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়,তাহলে উৎপাদিত ফসল যত প্রচুর পরিমানেই হোক না কেন,অথবা জনসংখ্যা যতই হ্রাস করা হোক না কেন,সর্বাবস্থায় জীবন-যাপনের সংকট লেগেই থাকবে ।

5. RbmsL¨v I AvqZ‡bi g‡a¨ mvgÄm¨Zv t

আপনারা আগেই জেনে এসেছেন যে পাকিস্তানের (বাংলাদেশসহ) আয়তনের তুলনায় বর্তমান জনসংখ্যা বেশি নয় । সাথে একথাও বিবেচনায় রাখা উচিৎ,এই সামঞ্জস্যতা দেশের সব প্রদেশের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়,এর একটা অনুমান এভাবে করা যেতে পারে যে পূর্ব পাকিস্তানের বসতির হার প্রতি মাইলে ৭৭১.৮ । অথচ বেলুচিস্তানের জনসংখ্যার হার প্রতি মাইলে ৮.৮ । এধরনের জনসংখ্যার হার দেশের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকম দেখা যায় । এই ব্যবধান দূর করতঃ এর একটা সামঞ্জস্যতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন । এমন যেন না হয় যে,দেশের সকল জনসংখ্যার চাপ কেবল দু'একটা প্রদেশে

পড়ুক আর অন্য সব প্রদেশ খালি পড়ে থাকুক। সামঞ্জস্যতা বজায় রাখতে হলে যে সব এলাকায় লোকসংখ্যা কম সেখানে মিল-ফেক্টরী,শিল্প-কারখানা স্থাপন করা উচিৎ। এবং সেই এলাকা গুলো বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক পদক্ষেপ নিয়ে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা উচিৎ। এভাবেই ঘন বসতি এলাকা থেকে হালকা বসতিপূর্ণ এলাকায় লোকদের স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। আর প্রত্যেক প্রদেশের মানুষ শান্তি ও স্বচ্ছলভাবে জীবন-যাপন করতে পারবে। একথা সত্য যে এটা একটা সুদুর প্রসারী পরিকল্পনা। এবং খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু দেশ ও জনগনের উন্নয়নের স্বার্থে এতটুকু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা কি খুবই অসম্ভব ব্যাপার?

6. দেশটাকে উন্নত করে গড়ে তুলতে ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিতে এসকল পদ্ধতি যদি অবলম্বন করা হয়,তাহলে একথা দাবী করেই বলতে পারি,দেশের জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাক তবুও মানুষ এদেশে না খেয়ে মরবে না । এবং জীবিকা নির্বাহে কষ্টের সম্মুক্ষিণও তাকে হতে হবে না। এসকল পদ্ধতি এমন যথার্থ যে,জন্মনিয়ন্ত্রণের মত জঘন্য ও ক্ষতিকারক পদ্ধতি অবলম্বন করার পরিবর্তে এগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে। অর্থ সংকট,বাসস্থানের সংকির্ণতা সহ যাবতীয় সংকট মোকাবেলায় খুব ভালভাবেই কার্যকর হতে পারে যা জন্মনিয়ন্ত্রণের দ্বারা মোকাবেলা করার জন্য কিছু লোক তৎপর হচ্ছে।

মুহাম্মদ তাকি উসমানী।
৮৭১, গার্ডেন ইস্ট করাচী।
১৭, ডিসেম্বর ১৯৬০।

ms‡hvRb

MfcvZ I Bmjv‡gi dvqmvjv t

আমাদের মূল কিতাবের এই দীর্ঘ ও তথ্য ভিত্তিক স্বারগর্ভ আলোচনার পর জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যপারে একজন সচেতন পাঠকের আর কোন বিষয় অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। মহান আল্লাহ তায়ালা ও পরকালে বিশ্বাসী একজন মু'মিন বান্দার আমলের জন্য এই কিতাব সঠিক দিক নির্দেশনা দিবে বলে আমরা যথেষ্ট মনে করি। জন্মনিয়ন্ত্রণের যাবতীয় খুটিনাটি বিষয় ও এর সঠিক ফায়সালা সুস্পষ্ট ভাবে এতে আলোকপাত করা হয়েছে। তবে 'গর্ভপাত' এর মত অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের আলোচনা রয়ে গেছে। যা মূলত জন্ম নিরোধের উদ্দেশ্যেই করা হয়ে থাকে এবং এযুগে এর ব্যাপক প্রচলনও লক্ষ করা যাচ্ছে। বিষয়টির গভীর তাৎপর্যতা ও প্রয়োজীয়তার কারণ অনুধাবন করতঃ পাঠকদের উপকারার্থে এর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও এর ব্যাপারে শরীয়তে ইসলামিয়ার সঠিক ফায়সালা কি? তা জানার প্রয়াস পাব ইন্‌শা আল্লাহ।

MfcvZ wK?

গর্ভপাত বলা হয়,গর্ভের সন্তানকে অকালে নষ্ট করে ফেলা। চাই তা একেবারে সূচনা লগ্নে (শুক্রানো-ডিম্বানো) হউক, অথবা এর কিছুদিন পর ভ্রুণ নষ্ট করার দ্বারা। অথবা মানবাকৃতি ধারণ করার পর প্রাণ সঞ্চারের পূর্বে হউক অথবা প্রাণ সঞ্চারের পরে। তাহলে বুঝা গেল গর্ভপাত চার ধরণের হয়ে থাকে।

১। ই,সি,পি তথা ইমারজেন্সী কর্নটাসেফইট পিল। ২। এম,আর তথা ভ্রুণ হত্যা। ৩। গর্ভপাত,প্রাণ সঞ্চারের পূর্বে। ৪। গর্ভপাত প্রাণ সঞ্চারের পর।

১। Bwmwc. Z_v Bgvi‡RÝx KbUv‡mdBU wcj t অর্থাৎ পুরুষের বীর্য মহিলার জরায়ুতে পৌঁছার পর এক ধরনের জন্ম প্রতিরোধক ঔষধ (জন্ম নিরোধের উদ্দেশ্যে) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যার দ্বারা মহিলার

জরায়ু থেকে পুরুষের বীর্যটা ইমারজেন্সী ভিত্তিতে বের হয়ে আসে। সন্তান ধারণ হওয়ার আশংকা থাকেনা। এধরণের ঔষধ ৫০%-৮০% কার্যকর বলে বিবেচিত। যা সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পরপরই করা হয়ে থাকে। এমনকি দু'মাসের অন্তসত্ত্বা হওয়ার পরও এ জাতীয় ঔষুধ কার্যকরি বলে প্রমানিত|

G e¨cv‡i kixq‡Zi dvqmvjvt-

উপরোল্লিখিত পন্থা অবলম্বন করতঃ সন্তান সম্ভাবনাকে নস্যাত করে দেয়া ইসলামি শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। যদিও এটা এখনো মাত্র বীর্য। মানবদেহের আকৃতি ও প্রাণ সঞ্চারিত না হওয়ার দরুণ একে নষ্ট করে দেয়া পারিভাষিক হত্যার গণ্ডিতে পড়েনা। কিন্তু তাকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিলে তো পূর্ণ একটি মানব সত্ত্বার রূপ ধারণ করত। তাই ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রেখে উক্ত বীর্যকে জীবিত সত্ত্বার হুকুমে ধরা হয়েছে।

ফিকাহবিদগণ তার দৃষ্টান্ত হিসাবে নিম্নোক্ত মাসআলাটি পেশ করে থাকেন। আর তা হলো যে, যদি কোন ব্যক্তি হজ্জের এহরাম অবস্থায় চড়ুই পাখির ডিম ভেঙ্গে ফেলে। তখন যেমনিভাবে চড়ুই পাখি মারার কারণে তার উপর দম ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়, তেমনিভাবে ডিম ভাঙ্গার কারণেও দম ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। সুতরাং যেভাবে এ মাসআলায় বর্তমানের উপর ভবিষ্যতের হুকুম দেওয়া হয়েছে তেমনি ভাবে মানব বীর্য যা মহিলার জরায়ুতে পৌঁছে গেছে ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তার উপর জীবিত নফসের হুকুম লাগানো হয়েছে।

এ সম্পর্কে বিখ্যাত হানাফী আলেম আল্লামা শামছুল আইম্মা সারাখসী (রহঃ) লিখেন- গর্ভাশয়ে স্থিত পানি যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাভাবিক থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা জীবন লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত। সুতরাং এই পানিকে ধ্বংস করা তেমনই দণ্ডনীয় অপরাধ যেমন তা জীবিত অবস্থায় ধ্বংস করা অপরাধ। (মাবসূত: ২৬;৮৭) আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহঃ) এর মতে বীর্য মহিলার গর্ভে পৌছার পর শেষ পর্যায়ে জীবের আকার ধারণ করে,তাই বীর্যের উপর জীবিত মানুষের হুকুম প্রয়োগ করা হবে। যেমন চড়ুই পাখির ডিম ভেঙ্গে ফেলা জীবিত চড়ুই পাখি হত্যার ন্যায়। বিখ্যাত মালিকী আলেম শায়খ আহম্মদ উলাইশ (রহঃ) লিখেছেন

জন্ম নিরোধের উদ্দেশ্যে ঔষধ ব্যবহার করা নাজায়েজ। গর্ভাশয়ে শুক্রাণু গৃহীত হবার পর স্বামী-স্ত্রী অথবা তাদের বাদীদের মালিকের পক্ষেও গর্ভপাতের চেষ্টা করা নাজায়েজ। তাতে অঙ্গ সৃষ্টির পূর্বেরও একই বিধান। (ফতুহুল আলী আল-মালিকী- ১:৩৯৯)

বিখ্যাত শাফী আলেম আল্লামা তাজুদ্দীন বিন সালাম বলেনঃ- "এমন ঔষধ ব্যবহার করা,যার দ্বারা গর্ভ ধারণ ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়,জায়েজ নেই।" এই বিষদ বর্ণনার মাধ্যমে এই কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে,জন্মবিরতির ঔষধ এবং এজাতীয় যে কোন পন্থা অবলম্বন করা নাজায়েজ হওয়ার উপর সকল গবেষনা কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য ওলামায়েকেরাম একমত। কোন অসাধারণ ওজর ব্যতিত শুধু সন্তান থেকে বাঁচার জন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা আদৌ জায়েজ নেই। হ্যাঁ যদি গর্ভ ধারণের কারণে বড় ধরণের ক্ষতির সম্মুক্ষীন হতে হয় তখন এই ছোট ক্ষতির দিকে লক্ষ্য না করে বড় ক্ষতি থেকে বাঁচতে অস্থায়ী যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। তবে তা অবশ্যই কোন দ্বীনদার বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে হতে হবে।

2| Gg,Avi Z_v å"Y nZ¨v Kiv t

জন্ম বিরতির আরো একটি পদ্ধতি হলো এম,আর তথা অকাল প্রসব করা,ভ্রুণ হত্যা করা। এম,আর হলো এক ধরণের টিউব (মোটা সিরিঞ্জ) ইউটেরাসের ভিতর প্রবেশ করিয়ে তার মাধ্যমে ডিম্বানো ও শুক্রাণোকে বের করে দেয়া হয়। এটা সাধারণত: অন্তসত্ত্বা হওয়ার ২মাস পনের দিনের ভিতর করা হয়। এর থেকে বেশি সময় হয়ে গেলে অপারেশন বা এধরণের জটিল কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্নান্য পদ্ধতি সমূহের ন্যায় এটাও বিনা ওজরে করা নাজায়েজ।

3| MfcvZt cvY mÂv‡ii c‡e

অর্থাৎ মায়ের গর্ভে সন্তান পরিপূর্ণরূপে অথবা আংশিক মানবাকৃতি ধারণ করেছে তবে প্রাণ সঞ্চারিত হয়নি,এমন সন্তানকে কোন ঔষধ,অপারেশন অথবা কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে অকালে গর্ভপাত করানো।

এ ব্যপারে ইসলামের বিধানঃ সম্মানিত পাঠক মহোদয়,পূর্বের দুটি আলোচিত বিষয় ও এর শরয়ী ফায়সালা জানার পর বর্তমান বিষয়টি সম্পর্কে সহজেই বুঝতে পারবেন যে এটা পূর্বের দুটি বিষয়ের তুলনায় জটিল। সেগুলো যদি নাজায়েজ হয়ে থাকে তাহলে বর্তমান বিষয়টি জায়েজ হওয়ার কোন অবকাশই থাকার কথা নয়। তাথাপি আমাদের ফিকাহবিদগণের অভিমতগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করছি যাতে বিষয়টি সূর্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়। এব্যাপারে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহঃ) লিখেন ঃ- "যদি গর্ভের সন্তানের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পেয়ে যায়। যথা নখ,চুল,তাহলে তাকে পরিপূর্ণ মানুষের হুকুমে ধরা হবে।" আল্লামা খিজির বেক (রহঃ) এর মতে ঃ "সন্তান পূর্ণ দেহ গঠনের পূর্বে মায়ের অংশ হিসেবে বিবেচিত। আর পূর্ণ দেহ গঠনের পর আলাদা সত্ত্বা হিসেবে বিবেচিত হবে,উক্ত বাচ্চা জীবিত মানুষের মত প্রাপ্য পাবে,সে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে অংশ পাবে,তার ব্যাপারে অছিয়ত সঠিক হবে,এবং মা যদি দাসি হয় তবে মাকে স্বাধীন না করে শুধু উক্ত গর্ভজাত সন্তানকে স্বাধীন করে দেওয়াও সঠিক হবে। এধরণের বাচ্ছা নষ্ট করে ফেলা ফিকাহ বিদগণের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম ও নাজায়েয। বরং কেউ যদি কোন অন্তঃসত্ত্বা মহিলার পেটে আঘাত করে,যার ফলে গর্ভনষ্ট হয়ে যায়,চাই তার আকৃতি পরিপূর্ণ হোক বা না হোক,উলাময়ে কেরামের ঐক্যমতে উক্ত ব্যক্তির উপর একটি গোলাম বা বাঁদী আযাদ করা ওয়াজিব।"

এমনিভাবে ইমাম শাফী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর নিকট প্রাণ সঞ্চার হওয়ার পূর্বে মাতৃগর্ভে পালিত বাচ্চার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। আর তা নষ্ট করা তাদের মতে অত্যন্ত নিন্দনীয় অপরাধ। এমনিভাবে আল্লামা শারফুদ্দীন (রহঃ) এর মতে বুঝা যায় এই উদ্দেশ্যে যত প্রকার পন্থাই অবলম্বন করা হোক চাই মারপিট,ঔষধ সব নাজায়েজ। যদি মহিলা নিজেই গর্ভ নষ্ট করে ফেলে তবুও জায়েজ নেই। এ ব্যাপারে ইবনে আবেদীন শামী (রহঃ) বলেন ঃ "একথা স্পষ্ট যে মানব আকৃতি প্রকাশ

পাওয়ার পর যদি পেটের বাচ্চা মায়ের কোন আচরণে মারা যায় তবে সেও হত্যার গোনাহগার হবে ।"

আল্লামা ইব্রাহীম নখয়ী (রহঃ)ও গর্ভের সন্তান নষ্ট করাকে স্পষ্ট নাজায়েজ হারাম ও জঘন্যতম কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেণ। মহিলা নিজে নষ্ট করলেও এর জন্য কাফফারা আবশ্যক হবে। মোটকথা গর্ভপাত সর্বাবস্থায় নাজায়েজ,প্রাণ সঞ্চাররের পূর্বে একে মায়ের একটি অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যেমনি ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করা হারাম তেমনি কোন মানুষের কোন অঙ্গকে বিনা কারণে কেটে ফেলে দেয়াও হারাম। মায়ের গর্ভের সন্তানের ব্যাপারে যদি কোন অসাধারণ মারাত্মক ওযর ও অপারগতা থাকে তাহলে ভিন্ন কথা,এছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় এমনটা করার কোন অবকাশ নেই।

4| MfcvZt cvYmÂv‡ii c‡i

আমাদের পূর্বের আলোচনা গুলো বুঝে থাকলে বর্তমান বিষয়টি বুঝতে কোন কষ্ট হওয়ার কথা নয়,কারণ এর হুকুম পূর্বের মাসআলা গুলো হতে আরো সুস্পষ্ট। হাদীস শরীফের ভাষ্যমতে গর্ভধারণের চার মাস অর্থাৎ একশ বিশদিন পর তাতে প্রাণ সঞ্চার হয়। খুব সম্ভব ভ্রুণ বিজ্ঞানিরাও এই মতকে সমর্থন করেণ। ভ্রুণে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার পর গর্ভপাত করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। কারণ গর্ভের সন্তানে প্রাণ সঞ্চার হওয়ার পর তা একটি জীবিত নফসে পরিণত হয়। তার মাঝে এবং অন্যান্য সন্তানদের মাঝে এতটুকু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যে,একটা হল মাতৃ গর্ভের পর্দার অন্তরালে আর দ্বিতীয়টা হল আবহমান পৃথিবীর বুকে। যেহেতু হত্যা বলা হয় জীবিত কোন সত্ত্বার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেয়াকে,চাই তা মায়ের গর্ভে হোক কিংবা এই পৃথিবীতে আসার পর হোক,সেহেতু উভয়টি হত্যা করা সমান অপরাধ বলে গণ্য হবে। ঔষধ দ্বারা হোক তাও হত্যা,আর অস্ত্র বা লাঠি দ্বারা হোক তাও হত্যা বলে গণ্য হবে। এব্যাপারে মালিকী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা আহমদ উলাইশ (রহঃ) বলেনঃ- "মাতৃগর্ভের সন্তানে প্রাণ সঞ্চার হওয়ার পর অকাল প্রসবের যে কোন পন্থা অবলম্বন করা সর্ব সম্মতিক্রমে হারাম। কারণ তা মূলত জীব হত্যার অন্তর্ভূক্ত।"

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) লিখেনঃ- গর্ভপাত মুসলমানদের সর্বসম্মাতিক্রমে হারাম এবং এটা জীবন্ত সন্তান কবরস্থ করারই নামান্তর। এ সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ- "যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কণ্যা সন্তানকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে,কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে।" (ফতুয়া ইবনে তাইমিয়া- ৪:৩১৭) তবে বাচ্চা যদি মায়ের গর্ভে জীবিত হয় আর তাকে ফেলে দেওয়া ব্যতীত মাকে বাচাঁনো অসম্ভব হয় সে ক্ষেত্রে গর্ভপাতের অনুমতি থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। কারণ এখানে দুটো ক্ষতির মধ্যে মায়ের ক্ষতির দিকটা বেশি মারাত্বক। তাছাড়া মায়ের জীবিত অবস্থা প্রত্যক্ষ,আর সন্তানের জীবনটা অপ্রত্যক্ষ। এর নজির হলো এমন যেমন ফকীহগণ বলেন কাফের সম্প্রদায় যদি নিজেদের বাহিনীর সামনে কিছু মুসলমান দাড় করিয়ে দিয়ে মানবঢাল হিসেবে নিজেদেরকে রক্ষা করার চেষ্ঠা করে তাহলে সে ক্ষেত্রে ইসলামী ভুখণ্ড রক্ষা করার লক্ষ্যে কিছু মুসলমানকে হত্যা করার অনুমতি দিয়েছে; তুলনা মুলক অধিক ক্ষতি থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে- এটাও অনুরূপ।
তথ্যসূত্রঃ- (১) হালাল হারাম-৩০৯-৩১৩; (২) ইসলামে নারী- ১৭৪-১৮০)

‡¯ú‡bi gw`‡` Mf©cv‡Zi wei“‡× wekvj mgv‡ek|

প্রথম আলো, সোমবার,১৯/১০/০৯ইং

স্পেনের মাদ্রিদে ১০ লক্ষ্যাধিক মানুষ গত শনিবার গর্ভপাত বিরোধী এক সমাবেশ করেছে। সরকার সম্প্রতি গর্ভপাত নিয়ে বিতর্কিত একটি আইন সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ সিদ্ধন্তের বিরুদ্ধে দেশের লোকজন রাজপথে নেমে আসে। বিরোধী মধ্য-ডান পন্থী কয়েকটি রাজনৈতিক দল শনিবারের এই বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। এ আন্দোলনের নৈতিক সর্মথন দিয়েছে রোমান ক্যাথলিক বিশপ। গর্ভপাত বিষয়ে সোশ্যালিষ্ট সরকার ঐ আইনের খসড়া ইতিমধ্যে তৈরি করেছে। গত মাসে মন্ত্রিসভা ঐ আইন অনুমোদন করেছে। আগামী মাসে এ নিয়ে পার্লামেন্টে বির্তক হবে। ক্যাথলিক স্পেনের বর্তমান আইনে কোন নারী বিশেষ পরিস্থিতিতে শুধু

গর্ভপাত ঘটাতে পারে। প্রস্তাবিত নতুন আইনে ১৬ থেকে ১৭ বছরের যে কোন মেয়ে নিজের অভিভাবককে না জানিয়ে গর্ভপাত ঘটাতে পারে। "ফোরাম ফর দ্য ফ্যামিলি" নামের এ আয়োজক সংস্থার প্রধান বেনিগনো ব্ল্যান্ধে বলেন, 'আজ এ বিক্ষোভে যারা অংশ নিয়েছে,তারা জীবন রক্ষার লড়াইয়ে শরিক হয়েছে। যারা আমাদের শাসন করছে তাদের রাজপথের এ উচ্চারণ শুনতে হবে।" বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ৬৭ বছর বয়সী হোসে কারলোস বলেন, 'এ ধরণের আইন করা বর্বরতা ছাড়া কিছুই নয়। সরকার পশুপাখি রক্ষায় যতটা সোচ্চার,মানব শিশু রক্ষায় ততটা উদাসীন।'

এ,এফ,পি ও বি,বি,সি।

chv‡jvPbv t গর্ভপাত নাজায়েজ ও অবৈধ, এ বক্তব্য কেবল ইসলামের-ই-নয়। বরং মানবতাবাদী প্রত্যেকটি লোকের প্রাণের স্পন্দন প্রতিধ্বনিত হয়েছে স্পেনের মাদ্রিদের বিক্ষোভকারীদের কণ্ঠে। ইসলামের এই শান্তি ময় বাণীটুকু দেরিতে হলেও তারা আজ বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে " এ ধরণের আইন করা র্ববরতা ছাড়া কিছুই নয়।" সরকার পশুপাখি রক্ষায় যতটা সোচ্চার, মানব শিশু রক্ষায় ততটা উদাসীন।'

অথচ ১৪শত বছর পূর্বেই ইসলামে এ ধরণের র্ববরতার তিব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ-

১। এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি অযথাই কোন মানব সন্তানকে হত্যা করল, সে যেন গোটা মানব জাতিকেই হত্যা

করল,আর যে, কোন মানব সন্তানের জীবন রক্ষা করল, সে যেন গোটা মানব জাতিকেই রক্ষা করল।" (মায়েদা-৩৩)

২। "তোমরা তোমাদের সন্তারদের হত্যা করোনা।"(বনী ইসরাঈল - ৩১)

৩। "আর যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে।"(তাকভীর-৮,৯)

মোট কথা বর্বর যুগের হত্যার আধুনিক রূপায়ন হলো গর্ভপাত। তা যে যুগেই করা হোক, যে ভাবেই করা হোক, সর্বাবস্থায়ই তা চরম গর্হিত কাজ অন্যায় ও বর্বরতা হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু মানুষ যখন স্বীয় বিবেক

বুদ্ধিকে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিত পথে ব্যয় না করে শয়তানের অনুসারি হয়ে যায়, তখন এ সকল বর্বরতাকেই সভ্যতা বলে মনে করতে থাকে। যেমনটা স্পেনের প্রশাসনের কতিপয় লোক মনে করছে এবং এর স্বপক্ষে আইন করছে।

Kwiqvb‡`i KvÊ

এমনিভাবে কুরিয়ানদের বর্বরতার কাহিনী শুনলে শরীর শিহরে উঠে। আর তা হলো, সে দেশে গর্ভপাতকৃত মানব শিশু নাকি তাদের কাছে দারুণ মজাদার খাদ্য। সেদেশের রেস্তোরাগুলিতে তা প্রকাশ্যে গরু ছাগলের মাংসের মত অবাধে বিক্রি ও খাওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় আইনে কোন বাধাতো নেই ই বরং তা ব্যাপকভাবে অনুমোদিত।

সুধিপাঠক! এ হলো আধুনিক সভ্যতার কিছূ চিত্র এবং মুক্ত চিন্তার ফসল। মানুষ যদি মহান আল্লাহর দিকনির্দেশনার পরিপন্থি নিজের জ্ঞানকেই পরিপূর্ণ মনে করত: অবাধ সিদ্ধান্ত নিতে থাকে, তাহলে এর চেয়ে ভয়ংকর ববর্রতাকে সে বৈধতা দেয়ার অপপ্রয়াস চালাবে। এমন কি জঙ্গলের হিংস্র পশুর ন্যায়, সবল মানুষ দূর্বল মানুষকে খেয়ে ফেলতেও দ্বিধা করবেনা। এবং এটাকে বৈধতা দেয়ার জন্যও তার যুক্তির অভাব হবেনা। তাই আসুন! আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা,সর্বময় ক্ষমতার মালিক, মহান আল্লাহর পথে চলি। গর্ভপাত, জন্মনিয়ন্ত্রণ সহ জীবনের প্রতিটি পদে পদে তাঁর নির্দেশ মেনে চলি। এবং মানবতার মুক্তি ও শান্তির দূত, তাঁর প্রিয় রসুল (সাঃ) এর আর্দশ গ্রহণ করি। আমাদের ইহ ও পরকালিন সকল অশান্তি দূর হয়ে শান্তির সোনালী সূর্য হেসে উঠবে আমাদের নতুন দিগন্তে

মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান।
০৫/১১/০৯ ইং
বাবলী জামে মসজিদ
তেজগাঁও শিল্প এলাকা,ঢাকা।